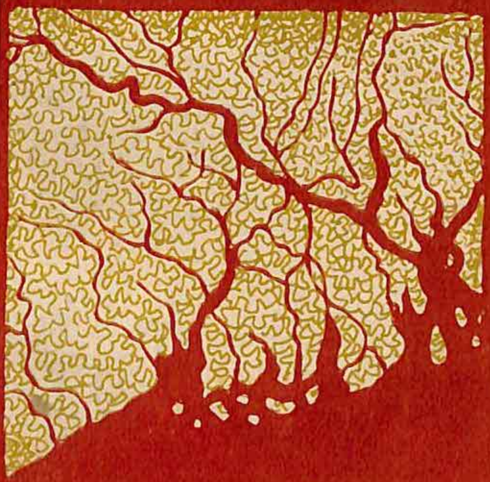
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস





ডঃ নির্মলেন্দু দাস
ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামী

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের নব প্রবর্তিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

(আদি ও মধ্যযুগ)

ড. নির্মলেন্দু দাস এম. এ. বি. টি., পি. এইচ. ডি.

ও

ডঃ কৃষ্ণপদ গোস্বামী এম. এ. পি. আর. এস., ডি. ফিল.

জ্ঞান প্রকাশন
২৩/১ কলেজ রো : কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়
২৩/১ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৮৫

মূল্য : আট টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীচন্দনকুমার বক্সী
প্রিণ্টিং সিণ্ডিকেট
৮ মদন ঘোষ লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের নূতন পাঠ্য-সূচী অনুযায়ী বর্তমান পুস্তকটি লিখিত। এই পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের জটিল তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে প্রবেশ করার কোন প্রয়োজন নেই। সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে একটা প্রাথমিক ধারণা গড়ে তোলাই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য। সে দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্যের ইতিহাসের বিতর্কিত জিজ্ঞাসা পরিহার করে যথাসম্ভব সরল সহজ ভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপিত করা হয়েছে। দু'একটি ক্ষেত্রে আদি ও মধ্যযুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে। সেগুলি পাঠ্যসূচীর দিকে দৃষ্টি রেখে খুব সরলভাবেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে।

এ গ্রন্থ প্রণয়নের সময় সহকর্মী বন্ধু শ্রীকানাইলাল দাস, এম. এ. বি. টি. প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে আলোকপাত করে গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেছেন। এ জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জ্ঞান প্রকাশনের কর্ণধার শ্রীজ্ঞানেন্দ্র কুমার রায় উৎসাহী না হলে এ গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। প্রিণ্টিং সিণ্ডিকেটের কর্মীরা খুব পরিশ্রম করে অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। এঁদের সকলেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে যাদের জন্য এ পুস্তক রচিত হলো তাদের সামান্য প্রয়োজনে লাগলে রচয়িতাদের শ্রম সার্থক হবে।

গ্রন্থকারদ্বয়

কোলকাতা
২৪শে জুলাই, ১৯৮৫

বাংলা "ক" ভাষা পাঠক্রম

আদি ও মধ্যযুগ

১। বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব ; বাংলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন এবং যুগ বিভাগ।

২। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ—চর্যাপদ ; সমাজ চিত্র ও সাহিত্য সম্পদ।

মধ্যযুগ

১। তুর্কীবিজয় ও তার ফলশ্রুতি—সামাজিক অবস্থা।

২। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী।
বি. দ্র. চণ্ডীদাস সমস্যার বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।

৩। (ক) কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ (খ) মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
(সংক্ষিপ্ত পরিচয়)

৪। মঙ্গল কাব্য রচনার সামাজিক কারণ এবং মঙ্গলকাব্যের তৎকালীন সমাজ জীবন।

৫। মনসা মঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা।
(বিজয় গুপ্ত, নারায়ন দেব এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ)

৬। সাহিত্য ও সমাজ জীবনে চৈতন্যদেব।

৭। চণ্ডীমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা।
(দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম)

৮। চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের প্রধান কবি ও কাব্যের পরিচয়।
(চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

৯। বলরাম দাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাসের পদাবলী।

১০। ধর্মমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা।
রূপরাম চক্রবর্তী (সংক্ষিপ্ত পরিচয়), প্রধানতঃ ঘনরাম চক্রবর্তী।

১১। কাশীরাম দাসের মহাভারত, সংক্ষেপে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর পরিচয়।

১২। আরাকান রাজসভার প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা : দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল।

১৩। ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল।

১৪। সামাজিক পটভূমিতে শাক্ত পদাবলী (রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত) এবং বাউল (লালন ফকির)

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব : আদি যুগ

প্রথম অধ্যায়	বাঙালী জাতি ও বাংলাভাষার উদ্ভব, বাংলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন এবং যুগ বিভাগ

ক. বাঙালী জাতির উদ্ভব

আধুনিক বিশ্বে বাঙালী জাতির সুনাম ও সুখ্যাতির কথা সকলেই জানেন। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকালের বহু বরেণ্য বাঙালী স্বীয় জাতির মর্যাদা তাঁদের নানা অবদান দিয়ে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার গৌরবও কম নয়। আধুনিক পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান তুলনামূলকভাবে অনেক উর্ধে।

বর্তমানে বাঙালী জাতির মূল আবাসভূমি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ। অতীতে এই দুই দেশের সীমারেখা আরও বিস্তৃত ছিল। উত্তর সীমায় হিমালয়, নেপাল, ভুটান, সিকিম ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। পূর্বে ছিল ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং পশ্চিম সীমান্ত রাজমহল থেকে বর্তমান ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। তখনকার বাংলাদেশ যে সব অঞ্চলে বিভক্ত ছিল সেই সব অঞ্চলগুলির নাম ছিল—রাঢ়, গৌড়, সুহ্ম, পুণ্ড্র বা বরেন্দ্র, ডবাব, বজ্জ, সমতট, তাম্রলিপ্ত, কামরূপ ইত্যাদি। সে যুগের বাংলাদেশের এইসব অঞ্চলগুলি ছিল পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন ; কোন রাষ্ট্রীয় ঐক্য ছিল না। খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে পাল রাজাদের সময় এই রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রচেষ্টা দেখা যায়। অবশ্য তার আগে সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে শশাঙ্কের সময় এই রাজনৈতিক ঐক্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার কথা ইতিহাস হতে জানা যায়। যাইহোক, সে যুগের আপাত বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশের অঞ্চলগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাধান্য লাভ করে পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ।

সেন রাজাদের আমল পর্যন্ত বঙ্গ শব্দটি প্রদেশ বা অঞ্চল বাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হত। তবুও ঐ সময় 'গৌড়-বঙ্গ' কথাটি বিশেষ চালু ছিল এবং গৌড়ই বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করে। লক্ষ্মণসেনের পলায়নের পর দেশ মুসলমানদের হাতে আসার পর 'বঙ্গ' শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহার হতে শুরু করে। তখন থেকেই 'বঙ্গ' শব্দটি আল অথবা আল্ + হ প্রত্যয় যোগে 'বঙ্গাল 'বঙ্গালা' দেশ বাচক এবং 'আলী' প্রত্যয় যোগে জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। (বঙ্গ+আল=বঙ্গাল ; বঙ্গালা<বঙ্গালহ ; বঙ্গ+আল+ঈ (আলী)=বঙ্গালী)। অনেকে বঙ্গ শব্দটিকে

তিব্বতী শব্দ 'বঙস' অর্থাৎ জলাভূমি হতে আগত বলে অনুমান করেন। কেউ কেউ 'মুাঅঙ' শব্দ থেকে বঙ্গ শব্দ আগত বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। 'বঙ্গ' শব্দটি অন-আর্য। ঐতরেয় আরণ্যকে 'বঙ্গ' শব্দটি পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ আটশ বছর আগে এই নামের উল্লেখ পাওয়া গেছে। মহাভারতেও 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ফলে প্রাচীন বঙ্গ ভূমিতে যারা বসবাস করত তারা ব্যাপকতর অর্থে বাঙালী ছিলেন। তাহলে বাঙালীরা কি সঙ্কর জাতি? রাঢ়, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র এগুলি সবই জাতিবাচক শব্দ। এই জাতিরা সকলেই গোষ্ঠীবদ্ধভাবে কোম জনপদ সৃষ্টি করেছিল। ইতিহাসের ছায়াপথ ধরে অগ্রসর হলে দেখা যাবে যে সেযুগের বাঙালী জাতি তিনটি বিভিন্ন প্রাক্ আর্য নৃগোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিত। এই গোষ্ঠীগুলি যথাক্রমে—অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয়। গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রথম পর্যায়ে পড়ে অষ্ট্রিক মানবগোষ্ঠী। এরা পূর্বভারত হতে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ভারতে এদের নাম কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ভূমিজ ইত্যাদি। প্রাচীনকালে এদের বলা হতো নিষাদ। এরা অন-আর্য, কৃষ্ণ এবং খর্বকায় জাতি। পরবর্তী গোষ্ঠীরা হচ্ছে দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর লোকেরা। এরা বর্তমান দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী তেলেগু, তামিল, কানাড়ী, মালায়লাম প্রভৃতি ভাষাভাষীদের পূর্ব পুরুষ। মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর মানুষদের পূর্বপুরুষেরা আসামের গারো জয়ন্তিয়া পাহাড়, ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বসবাস করতো। এরা চীন-তিব্বতের মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর মানুষ। বর্তমানে এরা মিরি, নাগা, মেচ ও উত্তরবঙ্গের কোচ-বাহে, ত্রিপুরার চাকমা ও টিপরাই এবং চট্টগ্রাম—আরাকান অঞ্চলের মগ উপজাতি নামে পরিচিত। এদেরই প্রাচীনকালে 'কিরাত' বলা হতো।

তবে অষ্ট্রিকরা এদেশে বসবাস করার আগে বাংলাদেশের আদিমতম অধিবাসী ছিল 'নিগ্রোবট'। এই 'নিগ্রোবট' জাতি পরবর্তীকালে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের সঙ্গে মিশে যায়। এভাবেই বাঙালী জাতির গোড়াপত্তনে প্রাচীন নিগ্রোবট, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং মোঙ্গলীয় জাতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। তবে কোন্ জাতির প্রভাব বঙ্গসংস্কৃতি বা জীবনযাত্রার উপর কত বেশি তা বলা সম্ভব নয়।

পণ্ডিতগণ মনে করেন ভোটচীন জাতি বা মঙ্গোলীয়দের প্রভাব খুবই কম। তাদের কয়েকটি বিশেষ চারিত্রিক গুণ ছাড়া আর বেশি কিছু ভারতীয় সভ্যতায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। সেই কারণে তারা অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষদের সভ্যতাকে মেনে নেয় এবং তাদের সঙ্গে মিশে যায়।

অষ্ট্রিকরা বাংলাদেশে কোল, মুণ্ডা ইত্যাদি জাতির মাধ্যমে নৃত্যগীত, বার ব্রত, গ্রাম্য দেবতা অথবা উপদেবতার প্রতি বিশ্বাস ও পূজা-পার্বন ইত্যাদি সাংস্কৃতিক দিকের প্রসার ঘটায়। এরা বাংলাদেশ তথা সারা ভারতে কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার

প্রবর্তন করেন। গ্রাম-জীবন কেন্দ্রিক সংস্কৃতির বাহক এরাই। অষ্ট্রিকরা যেমন পশু-পাখী শিকার করতো, তেমনি ধান, পান, কদলী, গুবাক অথবা সুপারী ইত্যাদি চাষের প্রসারক ছিল। এরা সরল, ধর্মভীরু এবং সত্যাশ্রয়ী ছিল। সংসার জীবনে এদের নারীর প্রাধান্য ছিল। এরা উৎসব প্রিয় জাতি হিসেবে সুপরিচিত।

অন্যদিকে দ্রাবিড়েরা অষ্ট্রিকদের তুলনায় আরও বেশি উন্নত ছিল। শোনা যায়, তারা আর্যদের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। দ্রাবিড়রাই নাকি প্রথম গম ও যবের চাষের প্রবর্তন করেন। এরা নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ ছিল। কৃষিকাজেও এরা পটু ছিল। দ্রাবিড়রা পরিশ্রমী, ভক্তিপ্রবণ এবং মরমী ছিল।

এভাবেই অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় জনগণ পারস্পরিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে যে জীবনপ্রবাহ ধারা অক্ষুন্ন রেখেছিল, আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সেই জনজীবন ধারার সঙ্গে আর্য জীবনধারার মিলন ঘটে এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যেই এদেশে আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিশেষভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। দু'হাজার-আড়াই হাজার বছরের মধ্যেই আর্যরা তাদের ভাষা ও সাহিত্যের সম্পূর্ণ প্রভাব অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতির মানুষের মধ্যে বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

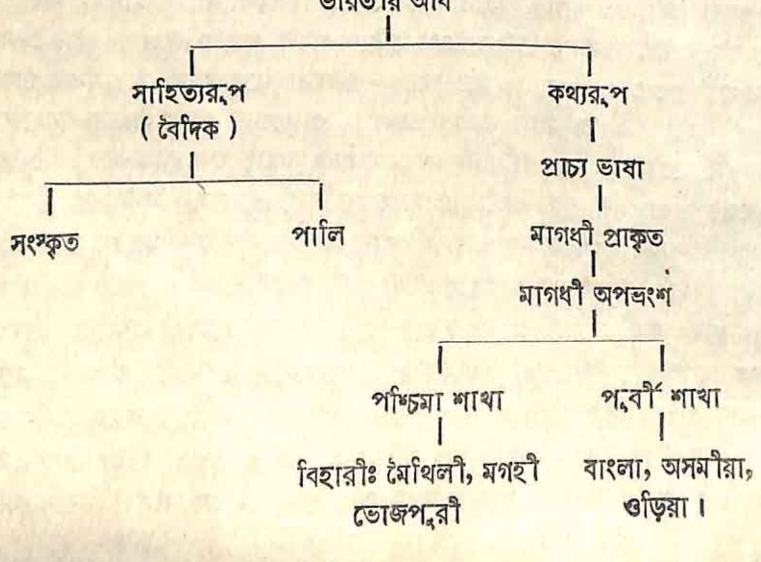
খ. বাংলা ভাষার উদভব

আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ শতাব্দীতে ভারতে সর্বপ্রথম আর্যদের আগমন ঘটে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ব আফগানিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের পর ধীরে ধীরে তারা ভারতের মধ্যভাগ ও অন্যান্য প্রান্তে উপবিষ্ট হতে থাকে। এভাবেই তারা পশ্চিম থেকে এগিয়ে মগধ পর্যন্ত তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং ভাষা অধিকার বিস্তার করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে আর্যরা বঙ্গদেশের সমস্ত রাঢ় অঞ্চল, আসাম, ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম পর্যন্ত তাদের ভাষা অধিকার জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে বিস্তার করে। আর্যরা মূলতঃ যে ভাষা নিয়ে ভারতে উপবিষ্ট হয়েছিল তা ছিল বৈদিক ভাষা। কালক্রমে এই ভাষা জনসাধারণের প্রয়োজনে সরলীকৃত হয়ে পাণিনির দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় রূপ লাভ করে। বৈদিক-সংস্কৃতের পাশাপাশি আর একটি ভাষা চালু ছিল তা হচ্ছে অ-বৈদিক ভাষা বা লৌকিক আখ্যান উপাখ্যানের ভাষা। আর্য ও অন-আর্যদের মিশ্রণের ফলে বৈদিক সংস্কৃতের ধ্বনি ও শব্দ সমূহ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তা ছাড়া আর্যরা পশ্চিম হতে যতই পূর্বে অগ্রসর হচ্ছিল ততই সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগত পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল। যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণসমূহে এমনকি ঋগ্বেদের মধ্যেও অন-আর্য প্রভাব সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। সাধারণ জনগণের কাছে বৈদিক যেমন সহজে অনুসারিত হয়নি—পাণিনির সংস্কৃতও অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের কাছে কঠিন এবং দুর্বোধ্য ছিল। ফলে বোধগম্যতার জন্য ধর্মতত্ত্ব অথবা পুরাণ কাহিনী

এ সময় লৌকিক ভাষায় লিখিত হয়েছিল। এই লৌকিক ভাষা ছিল পালি-অপভ্রংশ প্রাকৃত। মধ্যভারতীয় আর্যস্তরে মহাযান পন্থী বৌদ্ধরা সংস্কৃত-প্রাকৃত মিশ্র ভাষায় তাদের ধর্মপুস্তক রচনা করেছিলেন। এ ভাষাকে সে যুগে **বৌদ্ধ-সংস্কৃত** অথবা **গাথা-ভাষা** বলা হতো।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বঙ্গদেশেও সংস্কৃতভাষা যথাযথভাবে জৈন ও বৌদ্ধদের কাছে ধর্মপ্রচারের একমাত্র মাধ্যম হয়ে উঠে নি। প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষার মাধ্যমে এই দুই ধর্মের তত্ত্ব কথা জনসাধারণ্যে প্রচারের চেষ্টা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মৌর্যযুগেই বাংলাদেশ মগধ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময় মাগধী প্রাকৃত এবং মাগধী অপভ্রংশ ভাষা জনগণের লৌকিক ভাষা ছিল। এবং পরবর্তীকালে খ্রীষ্টীয় দশম শতকে মাগধী অপভ্রংশ বাংলা ভাষায় পরিণত হয়।

একটু বিস্তৃতভাবে উপরের প্রসঙ্গটি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, খ্রীষ্ট-পূর্ব পাঁচ শ শতাব্দীতে বৈদিক কথ্যরূপ হতে অন্তত পাঁচটি পৃথক উপভাষাগোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়েছিল। (১) উদীচ্য, (২) প্রতীচ্য, (৩) মধ্যদেশীয়, (৪) প্রাচ্য, ও (৫) দাক্ষিণী। খ্রীষ্ট জন্মের কিছু পরে এই পাঁচটি কথ্য রূপ মূল প্রাকৃত হতে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, পৈশাচী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক প্রাকৃতে রূপান্তরিত হয়। এবং খ্রীষ্টীয় ৬০০ শতকে এই প্রাকৃতগুলি বিভিন্ন অপভ্রংশ ভাষায় রূপান্তরিত হয়। ধীরে ধীরে এই অপভ্রংশ ভাষাগুলি পরিবর্তিত হয়ে বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী ইত্যাদি নব্যভারতীয় আর্যভাষায় রূপান্তরিত হয়। ফলে, আধুনিক বাংলাভাষার উৎপত্তি ঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্য (কথ্যরূপ) > পূর্বী প্রাচ্য > মাগধী প্রাকৃত > মাগধী অপভ্রংশ। মাগধী অপভ্রংশের পূর্বী শাখা হতেই বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া ইত্যাদি শাখার জন্ম।



গ. বাংলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন

বাংলাদেশে বাঙালীর সাহিত্যচর্চার বাহন প্রাথমিক স্তরে নিঃসন্দেহে সংস্কৃত ছিল। কারণ, দশম শতকে মাগধী অপভ্রংশ ভাষার পূর্বী শাখা হতে বাংলা ভাষার রূপান্তর হয়। ফলে, এর পূর্বে বাঙালীর সাহিত্যচর্চা, সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষায় হয়েছিল। 'সদুক্তিকর্ণামৃত' এবং 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আবিষ্কৃত 'দোহা কোষে' তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' হতে সে যুগের বাঙালীর সাহিত্যচর্চা তথা বাঙালীর গার্হস্থ্য চিত্রের একটি উদাহরণ দেওয়া হলো ঃ

ওগ্গর ভত্তা রম্ভঅ-পত্তা গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ-সজুত্তা।
মোইলি-মচ্ছা নালিচ-গচ্ছা দিজ্জই কন্তা খা পুণবন্তা ॥

[কলাপাতায় গব্য ঘৃত সংযুক্ত গরম ভাত ; সেই সঙ্গে মৌরলা মাছ এবং নালচে শাক। স্ত্রী পরিবেশন করছেন ; পুণ্যবান ব্যক্তি খাচ্ছেন।]

এমনিভাবে বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির আগে অন্য ভাষায় বাঙালীর সাহিত্য সৃষ্টির বহু পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় সাহিত্য রচনার পরই দশম শতকে চর্যাপদের মাধ্যমে প্রথম বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির দৃষ্টান্ত মিলে।

মোটামুটি গুপ্ত যুগ হতে পাল-সেন যুগের সময় সীমার মধ্যে বাঙালীর সাহিত্য সাধনার আরম্ভ এবং বিকাশের সূত্রপাত কাল।

ঘ. বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ

বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে অনেক অংশে সংযুক্ত। কারণ ইতিহাস যেমন মানবগোষ্ঠী এবং তার সমাজের আবর্তন বিবর্তনকে নিয়ে রচিত হয় ; সাহিত্যও ঠিক তেমনি এই মানবগোষ্ঠী ও তার সমাজের আবর্তন বিবর্তনকে নিয়ে রচিত হয়। ইতিহাস যেখানে তার মালমশলা গাছিত রাখে ; সাহিত্য সেই মালমশলার মধ্যে প্রাণের ধারাটি অন্বেষণ করে। তাই বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ অনেক অংশেই বাঙালীর ইতিহাস-আশ্রয়ী।

১. বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ (প্রাক্ তুর্কী আক্রমণ যুগ)
(আনুমানিক ৯০০—১২০০ খ্রীষ্টাব্দ)

২. বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ (তুর্কী আক্রমনোত্তর যুগ)
(আনুমানিক ১২০০—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ)
   (ক) বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্য পর্যায় (প্রাক্ চৈতন্য যুগ)
   (আনুমানিক ১২০০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ)
   (খ) বাংলা সাহিত্যের পর মধ্য পর্যায় (চৈতন্য পর অথবা চৈতন্য প্রভাবিত যুগ)
   (আনুমানিক ১৫০০—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ)

৩. বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ (ইউরোপ প্রভাবিত যুগ)
(প্রায় ১৮০০—খ্রীষ্টাব্দ হতে বর্তমান কাল)

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ—চর্যাপদ : সমাজ চিত্র ও সাহিত্য সম্পদ

ক. চর্যাপদ

চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদিতম নিদর্শন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজদরবার হ'তে আরও তিনখানি দোহা-র পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার করেন। প্রায় নয় বছর পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হতে "হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা" এই নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। শাস্ত্রী মহাশয় ভেবেছিলেন সবগুলি দোঁহাই বাংলা ভাষায় রচিত। কিন্তু পরবর্তী কালে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক প্রথম গ্রন্থটির ভাষা কেবলমাত্র বাংলা ; বাকী গ্রন্থগুলি পশ্চিমা অপভ্রংশে লিখিত।

'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের' পদগুলি গীত আকারে লিখিত। প্রতিটি পদের শীর্ষে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে। ফলে এগুলি যে গীত হতো সে বিষয়ে সুনিশ্চিত অনুমান করা চলে। আবিষ্কৃত পুঁথিটি খণ্ডিত। সে জন্যে মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ এতে পাওয়া যায়। তবে পুথিমধ্যে একটি পদের সংখ্যা নির্ণিত নেই। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি চর্যাপদের একটি তিব্বতী সংস্করণ আবিষ্কার করেছেন, তাতে এই পদ সংখ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাগুলির ভণিতাংশে কবিদের নাম উল্লিখিত আছে।

ভাষাতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জানা যায় চর্যার পদগুলি দশম-একাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন সময়ে কবিরা রচনা করেছিলেন। সে সময়ে বাংলাদেশে পাল রাজারা রাজত্ব করতেন। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। চর্যার কবিরা সকলেই বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক ছিলেন। তাঁদের সিদ্ধা বা সিদ্ধাচার্য বলা হতো। তাঁরা তাদের সাধন তত্ত্বের গোপন কথা এই পদগুলির মাধ্যমে লিখে রাখতেন। ফলে, সাধারণ পাঠকের কাছে চর্যাপদের অর্থ দুর্বোধ্য। তাই চর্যাপদের অন্তর্নিহিত অর্থ ছাড়া এর একটি বহিরঙ্গ অর্থ আছে।

চর্যার কবিরা বাঙালী ছিলেন। সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানুষও সাধন চর্চা করতেন। কারণ কবিদের নাম থেকে তা অনুমান করা যায়। কাহ্নুপাদ, শান্তিপাদ ভুসুকু পাদ ইত্যাদি কবিরা মনে হয় সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। অন্যদিকে ডোম্বীপাদ, কুক্কুরীপাদ, শবরপাদ ইত্যাদি নাম থেকে মনে হয় এঁরা হয়ত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন, এবং পরবর্তীকালে সাধনমার্গের উচ্চস্তরে আরোহণ

করেছিলেন। অনেকের ধারণা চর্যার কবিদের অনেকের নাম সাংকেতিক অর্থে ব্যবহৃত হত। বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত বাংলাদেশের এই কবিরা সম্ভবত বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে ভীত হয়ে তাঁদের পুঁথিপত্র নিয়ে নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কারণ বখতিয়ার খিলজী বিহারের বৌদ্ধ মঠ লুণ্ঠন করেছিলেন। সেই ভয়ে ভীত হয়ে বঙ্গদেশের বৌদ্ধমঠের পণ্ডিতরা নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন এমন অনুমান করা অমূলক হবে না।

চর্যার ভাষা আদি যুগের বাংলা। তখনও পর্যন্ত নব্য ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত মাগধী ভাষা হতে প্রাদেশিক ভাষাগুলি সম্পূর্ণ নিজস্ব রূপ পায় নি। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্বিক বিচার করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে চর্যাপদগুলি বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার উপর ভিত্তি করে রচিত। তবে যেহেতু তখনও ভাষার পূর্ণরূপ ছিল অনেকটা অস্পষ্ট তাই অনেকে হয়ত মনে করেন, চর্যাপদে বাংলার চেয়ে পশ্চিমা অথবা শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষাই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য সে যুগের জনসাহিত্যের বাহণ-ই ছিল এই সব লৌকিক ভাষা।

চর্যাপদের রচনার মধ্যে রহস্যময়তা থাকার জন্য এর ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলা হয়। ভাষাগত গঠন, রূপকত্ব এবং সাঙ্কেতিকতার জন্য চর্যার ভাষা আলো আঁধারি। দ্ব্যর্থক এই পদগুলি একদিকে যেমন সে যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন, অন্যদিকে তেমনি বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক গোষ্ঠীর গুহ্য সাধন তত্বের রহস্যময় দলিল। চর্যার সব পদের অর্থ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তিব্বতীয় টীকাকার মুনিদত্তের সংস্কৃত টীকা হতে এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের সাহায্যে চর্যার অর্থবোধ করা সম্ভব হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ এখানে চর্যার কয়েকটি পদের অংশমাত্র উদ্ধৃতি দেওয়া হলো ঃ

১. তিণ ন ছুবই হরিণা—পিবই ন পাণী
হরিণা হরিণীর নিলয় ন জানী॥
হরিণী বোলই—এ হরিণা, শুণ তো।
এ বন ছাড়ি হোহু ভান্তো॥

[হরিণ তৃণ ছোঁয় না ; জল পান করে না। হরিণ (এবং) হরিণীর বাসভূমি জানিনা। হরিণী বলে, এই হরিণ, তুই শোন ; এ বন ছেড়ে ভ্রান্ত (পালাও) হও।]

২. সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥

[সোনায় ভরে গেছে করুণা নৌকা, রূপো রাখবার ঠাঁই নেই।]

৩. নগর বাহিরি ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ॥

[নগরের বাইরে ডোম্বী (ডোমের স্ত্রী) তোমার কুঁড়ে ; নেড়া ব্রাহ্মণ ছুঁই ছুঁই করে চলে যায়।]

খ. চর্যাপদের সমাজ চিত্র

চর্যার কবিরা সাধক সিদ্ধাচার্য হলেও তারা সমাজের মানুষ ছিলেন। তাঁদের সাধন তত্ত্বের গোপন কথা চর্যার মধ্যে নিহিত থাকলেও কবিরা তাঁদের কাব্যে সেযুগের সমাজ-জীবনের সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

চর্যার কবিরা সে যুগের নদীনালা সমাকীর্ণ বাংলাদেশের সুন্দর ভৌগোলিক চিত্র নানা কবিতার মধ্যে তুলে ধরেছেন। সে যুগের সমাজে ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণীর লোকেরা বাস করতো। অন্ত্যজ শ্রেণীর ডোমেরা নগরের বাইরে বাস করতো। তারা বেতের বা বাঁশের চাঙ্গারি, চুপড়ি, ধামা, কুলো ইত্যাদি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতো। ডোম এবং ডোম নারীরা খেয়া পারাপারের কাজ করতো। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ছিল দারিদ্র্য প্র-পীড়িত। একটি চর্যায় হতশ্রী জীবনের ছবি পাওয়া যায়ঃ

টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।
হাঁড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥

[টিলার উপর আমার ঘর ; কোন প্রতিবেশী নেই। হাঁড়িতে ভাত নেই ; অথচ অতিথি লেগেই আছে।]

তখনকার সমাজে চুরি-চামারি হতো। লোকে কার্পাসের চাষ করতো। কাঠ কেটে নৌকো বানাতো। ছোট নদীর উপর লোকে ধর্ম-কর্ম করার জন্য সাঁকো তৈরি করতো। জলপথে নৌকায় যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। মেয়েরা অলঙ্কার পরতো ; এবং আয়না ব্যবহার করতো। ধনীরা বিলাস খাটে বসে কর্পূর দেওয়া পান খেতো। নির্দিষ্ট স্থানে মদ বিক্রি হতো।

সমাজে উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে নাট্যানুষ্ঠান হতো ঃ

নাচন্তী বাজিল গায়ন্তী দেবী।
বুদ্ধ নাটক সুষমা হোই॥

[নৃত্য, বাদ্য ও গীত সহযোগে বুদ্ধনাটক সমাপ্ত হল।]

জলপথে ও স্থলপথে দস্যুদের ভয় ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের একটু ছোট নজরে দেখা হতো। বাদ্যভাণ্ড সহকারে বিবাহ উৎসব পালিত হতো।

চর্যার যুগের সুখ-দুঃখের এই জীবনযাত্রা আমাদের কাছে খুবই আকর্ষণীয় এবং এটি সে যুগের সমাজ জীবনের একটি সুন্দর তথ্য চিত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

গ. চর্যার সাহিত্য সম্পদ

চর্যার কবিরা তাদের সাধনতত্ত্ব সান্ধ্য ভাষায় রচনা করলেও এগুলি নিছক সাধনতত্ত্ব বিষয়ক কবিতা নয়, এর মধ্যে এক উজ্জ্বল সাহিত্য সম্পদ লুকিয়ে আছে। হাজার বছর আগে যখন বাংলা সাহিত্য সবেমাত্র হাঁটি হাঁটি পা পা করে সম্মুখবর্তী- সেই সময়ে রচিত এই পদগুলির সাহিত্যিক মূল্য আশা করা সত্যিই বিস্ময়কর।

সে যুগের কবিরা তাদের গুহ্য সাধনতত্ত্বের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে যে চিত্রকল্প, উপমা ইত্যাদি ব্যবহার করেছিলেন তা খুবই অর্থবহ এবং যথার্থ।

কবিরা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবন হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রকল্প আহরণ করেছেন। তাঁরা দেহকে বৃক্ষের সঙ্গে এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সেই বৃক্ষের পাঁচটি ডালের সহিত তুলনা করেছেন ঃ

কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীত্র পাইঠো কাল॥

[কায়া (একটি) তরু, (তার) পাঁচটি ডাল। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হল।]

শবরপাদের একটি কবিতায় উঁচু পর্বতের উপরে শবর-শবরীর কথা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥

[উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালা ; ময়ূর পুচ্ছ পরিহিত শবরী গলায় গুঞ্জার মালা।]

শুধু তাই নয়, অনেক কবিতায় অল্প কথার মধ্য দিয়ে সুন্দর কাব্যিক ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে। কোন কবিতায় জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রির বর্ণনা আছে, কোথাও নদীর খর স্রোতধারার কথা, আবার কোথাও আঙিনায় ফোটা সাদা কার্পাস ফুলের বর্ণনা রয়েছে। কোন কবিতায় গীতিমাধুর্যের মন্ময় ধনি অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে ঃ

তুলা ধুনি ধুনি আঁশুরে আঁশু।
আশু ধুনি ধুনি নিরবর শেষু॥

[তুলা ধুনে ধুনে আঁস আঁস হয়ে গেছে ; আঁস ধুনে ধুনে সব শেষ হয়ে গেছে।]

চর্যার কবিদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রবাদবাক্যময় কিছু রচনা আধুনিক কালের পাঠকদেরও বিস্ময়ের উদ্রেক করে ঃ

১. অপণা মাঁসে হরিণা বৈরী।
[হরিণ নিজের মাংসের জন্য নিজের শত্রু।]

২. দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাঅ।
[দোয়া দুধ কি বাঁটেই আবার ঢুকে যায়।] ইত্যাদি

কবিরা কাব্য রচনার ক্ষেত্রে ছন্দের অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। চর্যার অনেক কবিতা প্রাকৃত প্রভাবিত মাত্রা প্রধান পদাকুলক ছন্দে রচিত।

চর্যার কবিদের হয়ত সাহিত্যের মাধুর্যরস সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তাদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের ঊষালগ্নে যে সাহিত্য সম্ভার আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন তা ধর্মের মোড়কে আবরিত হলেও সাহিত্যের বিচারে অনন্য।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ মধ্যযুগ

প্রথম অধ্যায়

তুর্কীবিজয় ও তার ফলশ্রুতি—
সামাজিক অবস্থা···

বাংলা দেশের ইতিহাসে তুর্কী আক্রমণ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তখন সেন বংশের বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল। ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ইতিহাসের এক অশুভ মুহূর্তে তুর্কী বিজেতা বখতিয়ার খিলজি সামান্য কয়েকজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে লক্ষ্মণ সেনের শেষ বয়সের বাসস্থান এবং রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমন করেন। লক্ষ্মণ সেন বিনা প্রতিবাদে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করে সপরিবারে পূর্ববঙ্গের দিকে পলায়ন করেন। বাঙালীর ইতিহাসে এটি একটি চরম কলঙ্কময় অধ্যায়। লক্ষ্মণ সেনের এই পলায়ন তুর্কীদের রাজ্য দখলে যেমন সাহায্য করেছিল তেমনি সাহায্য করেছিল বিনা প্রতিরোধে অবাধ লুণ্ঠনে।

তুর্কীদের আক্রমণের আঘাতে সেদিনের বাঙালীর জাতীয় জীবনে দারুণ এক বিপর্যয় নেমে এসেছিল। এক অর্থে বাঙালী সেদিন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তারা শুধুমাত্র বাঙালীর অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করে ক্ষান্ত হয় নি, বাঙালীর ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক জীবনের উপরও কঠোর আঘাত হেনেছিল। এই আঘাতের তীব্রতা বাঙালীর অন্তঃস্থলকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। তুর্কীরা সে যুগের ধর্ম ও শিক্ষার কেন্দ্র বৌদ্ধ মঠ ও বিহার সমূহকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। অবাধে মূল্যবান পুথিপত্র ও ধর্মগ্রন্থে অগ্নি সংযোগ করে ভস্মে পরিণত করেছিল। আত্মরক্ষায় অধীর হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং পণ্ডিতগণ তাঁদের মূল্যবান পুথিপত্র নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল নেপালে, কামরূপে অথবা অন্য কোথাও। তাই পরবর্তীকালে বাঙালীর বহুসাহিত্য কীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে নেপাল অথবা অন্যত্র হতে।

ডঃ সুকুমার সেন বাঙালী জীবনের এই কলঙ্ককে কিঞ্চিৎ অপনোদন করে বলেছেন ঃ "শেষ অবধি বিদেশী শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না, তার কারণ এই নয় যে বাঙালীর বীরত্ব তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মুসলমান শক্তির বিজয় লাভের প্রধানতম কারণ হচ্ছে দেশের সঙ্ঘশক্তির অভাব।" বাঙালীর এই 'সঙ্ঘ শক্তির' অভাবের কারণ আছে। মৌর্য যুগ থেকে সেন যুগপর্যন্ত দেখা গেছে যদিও ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের ফলে আর্য ও প্রাগার্য জাতিগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে সংমিশ্রণ ঘটেছিল, তবুও আর্য ও প্রাগার্যের মধ্যে আত্মিক মেল বন্ধন ভালভাবে হয়নি। বিজেতা ও বিজিত সম্পর্ক জনগণের মন থেকে মুছে যায় নি ; যদিও সে সময়

আর্যাবর্ত এবং দাক্ষিণাত্যের মানুষদের আত্মিক মিলনের ফলে আর্যরা অনেক নমনীয় হয়ে উঠেছিল। এর ফলে সমাজের মানুষের মধ্যে একটি ভেদনীতি কাজ করছিল। এই বিভেদের মধ্যে ছিল অস্পৃশ্যতা এবং শ্রেণী বৈষম্য। যার ফলে অভিজাত সমাজের মানুষের বিদ্যাচর্চা, উৎসব অনুষ্ঠান অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সমাজের সাধারণ মানুষের কোন সংযোগ ছিল না। এই ব্যবধান সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এত সুদূর হয়ে উঠেছিল যে, তা ভিতরে-ভিতরে সবার অজ্ঞাতে জনশক্তির অবক্ষয় সৃষ্টি করেছিল। এর জন্য অবশ্য বাঙালী জাতি নিজেই দায়ী ছিল। যার জন্যে বিদেশী আক্রমন প্রতিরোধ করার মত কোন সঙ্ঘশক্তি গড়ে উঠতে পারে নি। বাঙালী জাতির এই আত্মিক অবক্ষয়ের মুহূর্তেই আসে তুর্কী আক্রমণের প্রবল আঘাত।

এই আঘাতের প্রত্যক্ষ ফল ছিল-তুর্কী আক্রমন পরবর্তী প্রায় দু' শতক ধরে বাঙালী সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন অবদান রাখতে পারেনি। এই কারণেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর কোন সাহিত্যিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্ত এবং অত্যাচার অন্যদিকে আত্মশক্তি সংগঠনে মনোযোগী বাঙালী দীর্ঘদিন সাহিত্য চর্চা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

তুর্কী আক্রমণের পরোক্ষ ফল ছিল খুবই গভীর এবং সুদূর। ধ্বংসের মধ্যে যেমন নূতনের জন্মলাভ হয়—তুর্কী আক্রমণের ধ্বংস স্তূপের মধ্যেই বাঙালীর আত্মসচেতনতাবোধের জন্ম হয়। বাঙালী উপলব্ধি করতে পারলো আত্মশক্তি বৃদ্ধি না করলে বহিঃশক্তিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তাই তুর্কী আক্রমনোত্তর বাংলা দেশের অভিজাত এবং সাধারণ শ্রেণীর মানুষ ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে নিজেদের মর্যাদার নির্মোক দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কেবলমাত্র শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনে পরস্পরের কাছাকাছি চলে এলো। অভিজাত ও সাধারণ মানুষের এই মিশ্রণের ফলে পরস্পরের মধ্যে সংস্কৃতিক বিনিময় সম্ভব হলো। ফলে আর্য অন-আর্য ; অভিজাত—সাধারণ সকলেই পরস্পরের দেব-দেবীকে স্বীকার করে নিল এবং ভেদাভেদ দূর করে অখণ্ড এক বাঙালী জাতি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলো। এই শুভ মিলন যেমন বাঙালীকে এক এবং অখণ্ড করে তুলল, তেমনি সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেখা গেল আর্যের দেব-দেবী অন-আর্যের পূজা পাচ্ছেন অথবা অন-আর্যের দেব দেবী আর্য দেব-দেবীর মর্যাদায় উন্নীত হচ্ছেন। যেমন আদিতে শিব, ধর্মঠাকুর, চণ্ডী অথবা মনসা অন-আর্য দেব-দেবী ছিলেন। পরবর্তীকালে এঁরা সকলেই আর্য দেব-দেবীর মর্যাদা পেলেন। ঠিক এমনি সামাজিক মিলনের ফলে তুর্কী আক্রমণোত্তর কালে জন্ম নিল মঙ্গল কাব্য।

চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। তুর্কী আক্রমণের পরে দেশের মধ্যে যে অস্থিরতা ও চঞ্চলতা ছিল ইলিয়াস শাহী সুলতানদের

আমলে, চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, সেই অবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কের মধ্যে নূতন করে বিভেদ দেখা দিয়েছিল ; কিন্তু তা ইলিয়াস শাহী সুলতান শামসুদ্দীন বরবাক শাহের সময়ে অনেকটা প্রশমিত হতে থাকে। তিনি হিন্দুদের সহযোগিতায় বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানী রাজত্বের সূচনা করেন। রাজদরবারে এ সময় যোগ্যতাসম্পন্ন হিন্দুদের ঠাঁই হতে লাগলো। সুস্থ পরিবেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আবার পুনরুত্থান ঘটলো। কোন কোন ইলিয়াস শাহী সুলতানদের সহযোগিতায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাভারত এবং ভাগবতের অনুবাদ শুরু হলো। এক কথায় সামাজিক স্থিতাবস্থা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ শাখার জন্ম হলো এবং সেই সঙ্গে সাহিত্য চর্চার পথও সুগম হলো।

পঞ্চদশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ নানাভাবে বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এরপরই আবার বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। সেই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে জাত্যাভিমানী বর্ণ হিন্দুরা নানা ভাবে সমাজের সাধারণ মানুষকে লাঞ্ছিত এবং প্রবঞ্চিত করতে থাকে। এই লাঞ্ছনা এবং প্রবঞ্চনার কারণ, সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বর্ণহিন্দুরা রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল এবং ইসলাম ধর্মের অন্তর্গত সুফী ধর্মের প্রভাব থেকে জন সাধারণকে দূরে রাখার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। এর ফলে, রক্ষণশীল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পরিকল্পিত ভাবে কয়েকটি অনুবাদ কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এইভাবে সামাজিক রীতিনীতির চাপ, অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদ প্রথা সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে বিব্রত, বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। এইসব কারণে ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুসলিম রাজদরবারে চাকরী পাওয়ার ইচ্ছায় এবং ইসলাম ধর্মের নব প্রবর্তিত সুফী ধর্মের প্রভাবে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে থাকে।

বাংলা দেশের সমাজ-ব্যবস্থার এই ভাঙনের মুখে পঞ্চদশ শতকের শেষপাদে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন 'হুসেন শাহ'। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয়ের কাছেই ছিলেন 'নৃপতি তিলক'। তাঁরই রাজত্বকালে আবির্ভাব ঘটে শ্রীচৈতন্যদেবের। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও উদার মানবিকতা দিয়ে সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে বিপুল পরিবর্তন আনলেন। তিনি যুক্তিতর্ক দিয়ে সমাজের রক্ষণশীলতাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলেন। ধর্মজীবনে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করলেন মানবিকতাবাদের নূতন আদর্শ। ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডীকে তিনি দূরে সরিয়ে দিয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল পরিমণ্ডল রচনা করলেন। তাঁর আবির্ভাবের আগে অথবা পরে রচিত হয়েছিল **শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন** এবং তাঁর ব্যক্তি-জীবনের প্রভাবে পরবর্তীকালে গড়ে উঠে 'চরিত কাব্য'।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী

ক. বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

প্রখ্যাত গবেষক স্বর্গীয় বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাংলা ১৩১৬ সালে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের অধিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির সংলগ্ন গোয়াল ঘরের মাচা হতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একটি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেন। ১৩২৩ সালে (ইংরাজী ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হতে বইটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। বইটির প্রথম পৃষ্ঠা, মধ্য এবং শেষাংশের কয়েকটি পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি। যার ফলে পুঁথিটির নাম এবং কবির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। বসন্তবাবু নিজে কাব্য খানির নামকরণ করেন 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।'

কাব্যের অন্তর্গত ভণিতাংশে কবি নিজেকে বড়ুচণ্ডীদাস নামে অভিহিত করেছেন। আবার কোথাও কোথাও নিজেকে বাসুলী দেবীর সেবক বলে উল্লেখ করেছেন। পুঁথি মধ্যে এটুকু ছাড়া কবির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যখানি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে গবেষক মহলে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। কারণ কাব্যটির আবিষ্কারের পূর্বে বাঙালী পাঠক চণ্ডীদাস নামে এক বাঙালী কবির মধুর পদাবলীর রসাস্বাদন করতেন। গবেষকগণ পদাবলীর চণ্ডীদাসের সঙ্গে বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্য বিচার করে তাঁরা যে এক ব্যক্তি নন সে সিদ্ধান্তে আসেন। পদাবলী আধ্যাত্মিক ভাবরসে পূর্ণ সে তুলনায় বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য স্থূল এবং আদি রসাত্মক। তা ছাড়া প্রমান পাওয়া যায় চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের কাব্যের রসাস্বাদন করে আনন্দ পেতেন। পদাবলীর চণ্ডী দাস চৈতন্য পরবর্তী কবি। বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্য স্থূল এবং আদি রসাত্মক। তাই অনেকে এই কাব্যের চৈতন্যদেব কর্তৃক রসাস্বাদন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু, অনেক তথ্য প্রমানাদির দ্বারা স্থির হয়েছে যে বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি। চৈতন্যদেব এই কাব্যের লৌকিক দিক অস্বীকার করেছিলেন নিশ্চয়ই, যার ফলে তিনি এ কাব্যের রসাস্বাদনে আনন্দ পেয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যখানির লিপি এবং ভাষা বিচার করে গবেষকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কাব্যটি পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে অথবা চতুর্দশ শতকের শেষভাগে রচিত। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এটিকে আদি মধ্যযুগের বাংলা ভাষার (আঃ ১২০০— ১৫০০ খ্রীঃ) একমাত্র নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

তা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধাকে কোথাও কোথাও চন্দ্রাবলী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী কালের কাব্যে দেখা গেছে রাধা ও চন্দ্রাবলী পৃথক নারী। এসব থেকে সাধারণভাবে অনুমান করা যায় বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্য পূর্ববর্তী ছিলেন এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস ছিলেন চৈতন্য পরবর্তী কবি।

কাব্যটির মধ্যে একটি আখ্যান অংশ আছে। আখ্যান অংশটি নিম্নরূপ ঃ

কংসকে বধ করার জন্য বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে লীলা করার জন্য স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী রাধা রূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হলেন। কৃষ্ণ রাধাকে চিনতে পারলেও রাধা কিন্তু কৃষ্ণকে চিনতে পারলেন না। মর্ত্যে তিনি আয়ান ঘোষের বধূরূপে পরিচিত। কৃষ্ণ যে কোন প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। পরে বড়ায়ির মধ্যস্থতায় তিনি কৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারলেন। এর ফলে কৃষ্ণ প্রসঙ্গে তাঁর মনের প্রতিকূলতা দূর হলো এবং কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন। কংস বধের জন্য কৃষ্ণ রাধাকে বৃন্দাবনে ছেড়ে মথুরায় চলে গেলেন। কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে রাধার বিলাপ এবং করুণ আর্তি প্রকাশিত হলো। তখন কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনার জন্য বড়াই মথুরায় উপস্থিত হলেন। এখানেই কাব্যখানি আকস্মিকভাবে খণ্ডিত।

বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্যটি ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত ; আদ্য এবং অন্ত্য খণ্ড খণ্ডিত। খণ্ডগুলি যথাক্রমে ঃ জন্মখণ্ড, তাম্বূল খণ্ড, দান খণ্ড, নৌকা খণ্ড, ভার খণ্ড, ছত্র খণ্ড, বৃন্দাবন খণ্ড, কালিয়াদমন খণ্ড, যমুনা খণ্ড, হার খণ্ড, বাণ খণ্ড, বংশী খণ্ড ও রাধা বিরহ। অনেকে মনে করেন, শেষ খণ্ড বড়ুচণ্ডীদাসের লেখা নয় ; কিন্তু পুঁথির অন্যান্য অংশের ভাব ও ভাষার সঙ্গে শেষাংশের মিল আছে।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম আখ্যান মূলক কাব্য। শুধু তাই নয়, এটি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম 'নাট-গীত'। কবি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর কাহিনীর বিষয়বস্তু সম্ভবতঃ প্রাচীন ভাগবত ও বিষ্ণু পুরাণ হতে সংগৃহীত। এই পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে সে যুগের প্রচলিত লৌকিক কাহিনীকেও তিনি কাব্যরচনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন।

কাব্যটির বিষয়বস্তুতেও মৌলিকত্ব আছে। এ কাব্যে নিছক রাধা কৃষ্ণের প্রণয় দেখান হয় নি। কাব্যের শেষাংশে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় দিকের উল্লেখ আছে। সে দিক থেকে কাব্যটি কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য রূপের যুগ্ম পরিচয় বহন করে। এই হিসেবে কাব্যটির মূল্য অপরিসীম।

আগেই বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন আখ্যায়িকা কাব্য হলেও নাট-গীত। পাঁচালি আকারে গীত হতো। সুতরাং এর মধ্যে যেমন নাটকীয়তা আছে, তেমনি আছে গীতি ধর্মীতা। কাব্যের মধ্যে তিনটি চরিত্র আছে ঃ কৃষ্ণ, রাধা বা চন্দ্রাবলী এবং বড়াই। বড়ুচণ্ডীদাস কাব্যটিকে সংঘাত মূলক সংলাপের মাধ্যমে রচনা করে বিশেষ

কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। তাই নাটকীয়তা এই কাব্যের একটি বিশেষ গুণ। নিম্নে রাধা ও কৃষ্ণের সংলাপের উদ্ধৃতি দেওয়া হলো ঃ

কৃষ্ণ ঃ কি বহিব ভার তোর বোলে নাহি ভাষ।
লোকেতে আহ্মার করাইলে উপহাস ॥
রাধা ঃ লোকে কেহে উপহাস করিব তোমারে।
কোণ গোআল সে নাহি বহে ভারে ॥

[কৃষ্ণ ঃ তোমার ভার কেমন করে বইব। তোমার কথার কোন ঠিক নেই। লোকে আমাকে উপহাস করছে।

রাধা ঃ লোকে কেন তোমাকে উপহাস করবে ? কোন গোয়ালা ভার বহণ করে না ?]

এমনিভাবে পারস্পরিক সংলাপের মাধ্যমে কাব্য এগিয়ে গেছে। কৃষ্ণ রাধাকে চেয়েছেন, রাধা প্রত্যাখ্যান করেছেন, আবার বড়াই দুয়ের মধ্যে মিলন সাধনের চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণ ছলে বলে কৌশলে রাধাকে পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই সব ক্ষেত্রে কৃষ্ণ চরিত্রে গ্রাম্যতা ফুটে উঠেছে। যাই হোক বড়ু চণ্ডীদাস রাধা চরিত্রটিকে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। বয়ঃসন্ধির ক্ষণ হতে রাধা চরিত্রটিকে তিনি মনঃস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্রমশঃ প্রকাশ করতে পেরেছেন। কৃষ্ণ চরিত্রটি চিত্রণের ক্ষেত্রে দৈব মহিমার প্রকাশ না থাকলেও রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়ের চরিত্রের মধ্যে মানবিক দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। রাধা বিরহ অংশে কবি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে রাধা চরিত্রের মানবিক দিকটির প্রকাশ করেছেন। এ অংশে রাধা চরিত্রে স্থূলতা অনেকাংশে কম।

এই ভাবে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে তাঁর জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, কৌতুকজ্ঞান এবং রসবোধের ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। এ কাব্যের আর একটি বড় সম্পদ বড়ু চণ্ডীদাসের লিরিক ধর্মী পদ রচনা। একটি বিশেষ ভাবকে কেন্দ্র করে কবি অনবদ্য গীতি কবিতার অনুরনন তুলেছেন। বংশী খণ্ড হতে নীচের উদ্ধৃতিটি রাধার আর্তির এক অপূর্ব লিরিক অনুভূতির পরিচায়ক ঃ

কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বে আকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥

[ও গো বড়াই কালিন্দী নদীর তীরে কে এই বাঁশী বাজায়? এই গোঠ-গোকুলে কে বাঁশি বাজায় ? আমার শরীর আকুল, আমার মন ব্যাকুল। বাঁশির শব্দে আমার রন্ধন গোলমাল হলো। ওগো বড়াই কে সে বাঁশি বাজায় আমাকে বলো। আমি দাসী হয়ে তার পদপ্রান্তে আত্ম সমর্পন করবো।]

অথবা, বড়ায়ি গো ॥

কত দুঃখ কহিব কাহিনী।

দহ বলি ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল

মোঞ নারী বড় অভাগিনী ॥

নন্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো আল

তার সঙ্গে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ ॥

গুপতে* রাখিতে কাজ তাক মোঞে বিকসিলোঁ

তাহার উচিত ফল পাইলোঁ ॥

[বড়াই গো, দুঃখের কাহিনী কত বলব। দহ বলে ঝাঁপ দিলাম, আমার কাছে তা শুকিয়ে গেল। আমি বড় অভাগিনী নারী। নন্দের নন্দন ও যশোদার পুত্র কানুর সঙ্গে প্রণয় বাড়ালাম। যে কাজ গোপন রাখতে হয়; আমি তা প্রকাশ করে ফেললাম। তার উচিত ফল পেলাম।]

এমনি ভাবে গীতিকাব্য ও নাট্যরস 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যটিকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করেছে। কবির কবিত্ব শক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে কাব্যখানি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব নিদর্শন। বড়ুচণ্ডীদাস এই কাব্যে নৌকাখণ্ড এবং দানখণ্ড এ দুটি নূতন লীলার প্রবর্তন করেছেন। এ দিক থেকে তিনি মৌলিকতা দাবী করতে পারেন।

ভাষা ও ছন্দ রচনার দিক থেকেও কবি কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। পয়ার, ত্রিপদী ছাড়া দু'এক ক্ষেত্রে তিনি অন্য ছন্দও ব্যবহার করেছেন।

বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্যে যে আন্তরিকতার সুর ধ্বনিত হয়েছে, মনে হয়, পরবর্তী কালের পদাবলীর চণ্ডীদের কাব্যে সেই মরমীসুরের সুদূর ব্যাপকতার কম্পন অনুরণিত হয়েছে।

খ. বিদ্যাপতির পদাবলী

বিদ্যাপতি মিথিলার কবি ছিলেন। তিনি বিহারের দ্বারভাঙা জেলার মধুবনী মহকুমার অন্তর্গত বিসফী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম গণপতি ঠাকুর।

বিদ্যাপতির পূর্বপুরুষগণ সে যুগের সাহিত্যের নানা বিভাগে বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন। গণপতি এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণ প্রায় সকলেই মিথিলার ব্রাহ্মণ রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। অনেকটা সে কারণে এবং বিদ্যাপতির পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য তিনিও মিথিলার একাধিক রাজসভাস্থলে বিশেষ সমাদর এবং মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর পিতৃপুরুষগণের অনেকে স্মৃতি সংহিতা, সংস্কৃত প্রহসন ইত্যাদি রচনা করে খ্যাতিমান হন। চণ্ডেশ্বর নামে তাঁর এক পূর্বপুরুষ 'বর্ণরত্নাকর' নামে সর্বপ্রাচীন মৈথিলী গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। গণপতি স্বয়ং "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী" নামে গঙ্গা মাহাত্ম্যের একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তিনি মিথিলার রাজসভা-কবি ছিলেন এবং পঞ্চাশ শতকে মিথিলার সিংহাসনের অধিষ্ঠিত বিভিন্ন রাজা, মন্ত্রী এবং রাজমহিষী সম্বন্ধে তাঁর পদাবলীর ভণিতায় উল্লেখ করেছেন। বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল এই সব রাজাদের রাজত্বকাল থেকে অনুমান করে একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায়।

বিদ্যাপতির প্রথম গ্রন্থ 'কীর্তিলতা' মিথিলার রাজা কীর্তি সিংহের সময়ে (কীর্তিসিংহের সময়কাল ১৪০২—১৪০৪) রচিত। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যাপতির জন্ম সময় অনেকে স্থির করেন চতুর্দশ শতকের শেষ দুই দশকে। অপরদিকে তাঁর শেষ তিনখানি পুস্তক 'বিভাগসার', 'দান বাক্যাবলী' এবং 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী' আনুমানিক ১৪৪০ হতে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়। ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে তাঁর আর কোন রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এইসব থেকে অনুমান করা যায় যে বিদ্যাপতির জীবনকাল ১৩৮০ হতে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বিদ্যাপতি নিজে বহুভাষাবিদ্ ও ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁর অসামান্য পান্ডিত্য ছিল। তিনি নানা ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন। সংস্কৃত, মৈথিলী এবং লৌকিক অবহট্ট ভাষায় তাঁর কাব্য রচনার দক্ষতা সর্বজন বিদিত। এছাড়া বিদ্যাপতি একটি কৃত্রিম ভাষায় কাব্য রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। এই ভাষার নাম ব্রজবুলি ভাষা। ব্রজবুলি বাংলা ও মৈথিলী ভাষার মিশ্রণে গঠিত। এই ভাষায় রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচিত হত। ষোড়শ শতকের বাঙালী কবিরা বিদ্যাপতির ভাষা অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেন। মৈথিলী ভাষার এই মিশ্রণ শুধুমাত্র বাংলার সঙ্গে ঘটেনি। অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষার সঙ্গেও মৈথিলী ভাষার মিশ্রণ ঘটেছিল এবং এর ফলেই ওড়িয়া ব্রজবুলি অথবা অসমীয়া ব্রজবুলি ইত্যাদি কৃত্রিম ভাষার উদ্ভব হয়েছিল। ব্রজবুলি ভাষার পদলালিত্য এবং ছন্দমাধুর্য ছিল অপূর্ব। এই কৃত্রিম ভাষা-স্রষ্টা বিদ্যাপতি নিজে যেমন বহু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন—সে যুগের বহু বাঙালী পদকর্তা এই ভাষা অনুসরণে কাব্যরচনা করেন। বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের সভাকবি থাকাকালীন রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেন।

ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনা ছাড়া বিদ্যাপতি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন, বিভাগসার, দান বাক্যাবলী, গঙ্গাবাক্যাবলী, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী, বর্ষক্রিয়া ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ। এছাড়া পুরুষ পরীক্ষা (কথা সাহিত্য) ও ভূ-পরিক্রমা (তীর্থ বিষয়ক পুস্তক) নামক পুস্তক তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। অবহট্ট ভাষায় তিনি 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' নামে দুটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। মৈথিলী ভাষায় 'হরগৌরী' ও 'রাধাকৃষ্ণ' বিষয়ক পদ রচনা করেন।

তিনি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন তা নয়—বৈষ্ণব শাক্ত নির্বিশেষে বহু দেবদেবীর উপাসনা করেছেন। অনেকের মতে তিনি পঞ্চোপাসক ছিলেন। ফলে ধর্ম সম্পর্কে কোন গোঁড়ামী তাঁর মধ্যে ছিল না।

বিদ্যাপতির ব্যক্তিত্ব ছিল খুবই তীক্ষ্ম। রাজসভা এবং রাজকার্য পরিচালনা প্রসঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। বাস্তব বোধ এবং বিষয় সম্বন্ধে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। এক কথায় বিদ্যাপতি সেযুগের একজন প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্রতিভাবান কবি মনীষী ছিলেন।

তবে বিদ্যাপতি বিভিন্ন ভাষা ও নানাবিধ গ্রন্থ রচনা করলেও বাংলা সাহিত্যে এবং বাঙালী পাঠকের কাছে তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচয়িতা হিসেবে সমধিক খ্যাত। সেদিক থেকে তিনি মিথিলার চেয়ে বাংলাদেশের জনপ্রিয় কবি। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতকে মিথিলার সঙ্গে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। মিথিলা এক সময় শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র ছিল। সেই হিসেবে বহু বাঙালী ছাত্র মিথিলায় গিয়ে পড়াশুনা করত। এইসব কারণে মিথিলার সঙ্গে বাংলাদেশের একটি সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ফলে, বিদ্যাপতির পদ বাঙালী পাঠক সমাজকে নন্দিত করে এবং বাঙালী কবিদের তাঁর পদের অনুকরণে পদরচনায় অনুপ্রাণিত করে। এই জন্যে তিনি বাঙালী না হয়েও বাঙালীর হৃদয়ে তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য স্থায়ী আসন লাভ করে আছেন।

বিদ্যাপতি প্রতিভাবান কবি ছিলেন। তাঁর সেই কবি প্রতিভার পরিচয় বৈষ্ণব পদাবলী রচনার ক্ষেত্রে ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত হয়েছে। যদিও পদাবলী সাহিত্যে কতকগুলি বিশিষ্ট রসপর্যায় অনুসরণ করে পদাবলীকাররা কাব্য রচনা করেছেন, তবুও এই রসপর্যায়গুলি বিচার করলে দেখা যাবে যে এর মধ্যে মানব হৃদয়বৃত্তির একটি সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক ক্রমপরিণতি রয়েছে। নরনারীর প্রেমের এই অনুভূতিগত ধারাবাহিকতা এই রসপর্যায়গুলির মধ্যে বিধৃত। যেমন—পূর্বরাগ, অভিসার মান, মানভঞ্জন, কলহন্তারিতা, ভাবোল্লাস ও মিলন প্রার্থনা ইত্যাদি রসপর্যায় মানব প্রেমের ক্রমপর্যায় অনুযায়ী পদাবলী সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-মহিমা প্রকাশের ক্ষেত্রে অনুসারিত হয়েছে। বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের প্রণয় চিত্রণে বিশেষ করে রাধার ক্ষেত্রে অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি রাধা চরিত্রটিকে স্তরে স্তরে বিকশিত করেছেন এবং অভিনব শিল্প কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। রাধা চরিত্রের এই স্তরগুলি বিদ্যাপতির লিপিকুশলতায় নিম্নলিখিতভাবে ধরা পড়েছে।

১. বয়ঃসন্ধি ও পূর্বরাগ,
২. অভিসার মিলন এবং মান,
৩. মাথুর,
৪. ভাব সম্মেলন।

বয়ঃসন্ধির রাধার চিত্র রচনায় কবি রাধার অন্তরের অস্থিরতা এবং আকুলতা খুব সুন্দরভাবে মানবিক উপায়ে চিত্রিত করেছেন ঃ

খনে খনে নয়ন কোণ অনুসরই ।
খনে খনে বসনধূলি তনু ভরই ॥
খনে খনে দশন ছটাছট হাস ।
খনে খনে অধর আগে করু বাস ॥
চউকি চলএ খনে খনে চলু মন্দ ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥

রূপানুরাগের বর্ণনায় দেখা যায় কবি চিত্তের এক নিবিড় অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে নিম্নলিখিত পদটিতে ঃ

হাথক দরপন মাথক ফুল ।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥

অর্থাৎ তুমি আমার হাতের দর্পন, মাথার ফুল ; তুমি নয়নের কাজল, এবং মুখের তাম্বুল ।

অভিসারের বর্ণনায় কবির দক্ষতা সমধিক। কৃষ্ণ অনুরাগিনী রাধা সমস্ত লজ্জা, ভয় বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে চলেছেন ঃ

নব অনুরাগিনী রাধা ।
কছু নাহি মানএ বাধা ॥
একলি করল পয়ান ।
পথ বিপথ নাহি মান ॥

অভিসারের,পরই 'মিলন'। মিলনের বর্ণনায় বিদ্যাপতি অনবদ্য ঃ

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল ।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল ॥

'মাথুর' পর্যায়ে কবিত্ব সন্দেহাতীত ঃ

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর ।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
... ...
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া ।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥

'ভাবসম্মিলন' পর্যায়ে কবির বক্তব্য খুবই হৃদয়গ্রাহী ঃ

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরনন্দা ॥

শেষে মিলনের পরে আসে সেই আধ্যাত্মিক এবং অপার্থিব প্রেমানুভূতি। 'প্রার্থনার' পদে তাই দেখা যায় ঃ—

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥

মাধুর্য এবং কারুণ্যের প্রকাশে বিদ্যাপতির এই পদ অনন্য।

মধ্যযুগের কবি সমাজে বিদ্যাপতিকে কেউ কেউ 'মৈথিল-কোকিল' অথবা 'অভিনব জয়দেব' নামে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁকে 'মৈথিল-কোকিল' বলার কারণ তাঁর পদাবলী পদলালিত্য, বর্ণনা ভঙ্গি এবং অপূর্ব ছন্দ মাধুর্যের মিশ্রণে যে সুর ঝঙ্কার তুলেছে তা অনবদ্য। বাংলা সাহিত্যে তাঁর মৈথিলী ভাষায় কুজন তাঁকে মৈথিল-কোকিল আখ্যায় ভূষিত করেছে। অন্যদিকে তাঁকে 'অভিনব জয়দেব' বলার কারণ বিদ্যাপতি মূলতঃ ছিলেন রাজসভার কবি। রাজসভার বিলাস বহুল আড়ম্বর এবং তাঁর নাগরিক মানসিকতা তাঁর কাব্যের মধ্যে একটি বৈদগ্ধ্য রুচিবিলাসের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর পান্ডিত্য এবং অলঙ্কার-ছন্দজ্ঞান বিষয়বস্তুর মধ্যে একটা নাগরিক কবি মনের প্রলেপ ক্ষেপন করেছিল। এই জন্যে তাঁর কাব্যে রাজসভা প্রভাবিত চমৎকারিত্বের ছড়াছড়ি। তাঁর কাব্যে সংস্কৃত আদিরসাত্মক বিষয়ের প্রকাশও দেখা যায়। এইসব কারণে তাঁকে অনেকে জয়দেবের উত্তরসূরী হিসেবে 'অভিনব জয়দেব' নামে অভিহিত করে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি ও চন্ডীদাসের কাব্যের তুলনামূল বিচার করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "বিদ্যাপতি সুখের কবি, চন্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চন্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকেই সার বলিয়া জানিয়াছেন। চন্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন।" মৈথিলী কবি হয়েও বিদ্যাপতি সে যুগের জনমানসে যে স্থায়ী আসন করে গেছেন তা যুগ-যুগান্তরের ব্যবধানে কোন দিন ম্লান হবে না। চৈতন্যদেব স্বয়ং বিদ্যাপতির পদের রসস্বাদন করে তৃপ্ত হতেন।

বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত হাজার হাজার পদের মধ্যে কোনগুলি ঠিক ঠিক তাঁর রচনা তা নির্ণয় করা খুবই কষ্টসাধ্য। বিদ্যাপতির নামে বাংলাদেশের পদাবলী-কারদের রচিত বহুপদ আজও চলছে। উপযুক্ত গবেষণার দ্বারা বিদ্যাপতির মূল পদগুলি চিহ্নিত হওয়া খুবই প্রয়োজন।

গ. চণ্ডীদাসের পদাবলী

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পদাবলীকার হিসেবে চণ্ডীদাসের নাম একটি উজ্জ্বল সংযোজন। বাংলা সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। এঁরা যথাক্রমে বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, চণ্ডীদাস এবং দীন চণ্ডীদাস। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের রচয়িতা এবং তিনি চৈতন্য পূর্ববর্তী। চৈতন্য সমকালে অথবা চৈতন্যদেবের পরে আর একজন চণ্ডীদাস ছিলেন যিনি বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা হিসেবে বাংলাদেশের জনমানসে বিশেষ পরিচিত। তাঁর পদাবলীর প্রসাদগুণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তাই কবিগুরু তাঁর কাব্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন : "আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের প্রধান কবি। তিনি একছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠকদের দিয়া দেখাইয়া লন।" চণ্ডীদাস সম্পর্কিত কোন রকম বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে এই 'সহজ ভাষার এবং সহজ ভাবের' কবি সম্পর্কে আলোচনা করা আমাদের বর্তমান অধ্যায়ের আসল বিষয়বস্তু।

চণ্ডীদাসের ব্যক্তি পরিচয় সম্বন্ধে আজও উপযুক্তভাবে কোন আলোকপাত হয়নি। নানা জনশ্রুতিমূলক তথ্য থেকে অনুমান করা যায় চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে বাস করতেন। তিনি বাশুলী দেবীর উপাসক ছিলেন এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামী নাম্নী এক রজকিনী তাঁর সহজিয়া সাধন সঙ্গী ছিলেন। চণ্ডীদাস সম্পর্কিত এই জনশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই তাঁর সম্পর্কে জানা যায় না।

যাইহোক বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাসের নামে এমন কিছু পদ আছে যা দেখে মনে হয় এগুলির রচয়িতা অন্যজন; কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে পদগুলি চণ্ডীদাসের নামে চলে আসছে। মনে হয়, কবি-যশঃপ্রার্থী অক্ষম কবিদের এই রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাসের নামে প্রক্ষেপ হিসেবে চলে আসছে।

চণ্ডীদাস তাঁর পদাবলীতে রাধার চরিত্র আঁকতে গিয়ে বৈষ্ণব রসপর্যায়ের সব বিভাগেই অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিশেষ করে পূর্বরাগের পদে তিনি অতুলনীয় কাব্যবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর রাধা প্রথম হতেই কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা। কৃষ্ণকে না দেখে, কেবলমাত্র তাঁর কথা শুনে তিনি যে ভাবে কাতর হয়ে উঠেছেন তার নজির চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ পদে যেমন প্রকাশ পেয়েছে অন্য কোথাও তা দেখা যায় না।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

নাম পরতাপে যায় ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥

চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণপ্রেমে এমনই আত্মহারা যে বাস্তব পৃথিবীর কোন কিছুতেই তাঁর মন আচ্ছন্ন নেই। তিনি যেন যোগিনী—

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতী যোগিনী পারা॥

শুধু তাই নয়, কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য মুগ্ধা রাধার অস্থিরতার চিত্রটি চণ্ডীদাসের রচনায় অপূর্ব ভাবে ধরা পড়েছে ঃ

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্বকাননে চায়॥

'অভিসারের' পদে চণ্ডীদাস রাধা হৃদয়ের আকুলতা প্রকাশ করেছেন। বাইরে প্রবল বারিবর্ষণ। সঙ্কেত কুঞ্জে কৃষ্ণ এসে জলে ভিজছেন। একথা ভেবে চণ্ডীদাসের রাধার মনে অস্থিরতার শেষ নেই।

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইলে বাটে।
আঙিনার কোনে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

যার জন্য এত আকুতি এত অস্থিরতা সেই কৃষ্ণ যদি শ্রীরাধাকে ত্যাগ করে অন্য কোন নায়িকার কাছে যান তাতে চণ্ডীদাসের রাধার আক্ষেপ এবং দুঃখ প্রকাশ করেন ঠিকই তবে কোন বিদ্রোহের সুর সে কবিতায় খুঁজে পাওয়া যায় না ঃ

সই কেমন ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আনবাড়ী যায়
আমার আঙিনা দিয়া॥

চণ্ডীদাসের কাব্যের অনুপম সৌন্দর্যানুভূতি এভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। মানব হৃদয়ে সমস্ত চাওয়া পাওয়া এমনিভাবে এসে একস্থানে থেমে যায়। যখন শুধুমাত্র

কিছু অনুভববেদ্য সূক্ষ্ম অনুভূতি পাঠক চিত্তকে সচেতন করে তুলে। পাওয়ার চেয়ে হারানোর অনুভূতি চণ্ডীদাসের কবিতায় আরও গভীর। 'প্রেম বৈচিত্ত্য' পর্যায়ের কবিতাতে দেখা যায় মিলনের মধ্যে আসন্ন বিচ্ছেদের বিধুর চিত্র ঃ

দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥

কিন্তু যে কৃষ্ণ তাঁর হৃদয়কে এমনভাবে বেদনা বিধুর করে তোলেন সে কৃষ্ণের প্রেমের মূল স্বরূপ তিনি যেন বুঝে উঠতে পারেন না। যার জন্য ঘর কে 'বাহির' করলেন, দিনকে রাত করলেন সে বন্ধুর 'পিরীতি' যেন বোধগম্যতার বাইরে ঃ

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি ॥

মিলন কখনো সুদীর্ঘ হয় না। মিলনের পরে আসে বিরহ। সে বিরহের আর্তি বৈষ্ণব কবিতায় চণ্ডীদাসের লেখনীতে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এমনিভাবে দীর্ঘ বিরহের অবসান একদিন হয়। কৃষ্ণ ফিরে আসেন মথুরা থেকে। চণ্ডীদাসের রাধার তখন কোন অভিযোগ থাকে না অথচ হৃদয়ের অন্তস্থলে রয়েছে গভীর বেদনার অনুভূতি।

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইতে পরাণ গেলে ॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥

'মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল' এই উক্তি থেকেই মনে হয় চণ্ডীদাসের রাধা বাঙালী নারীর হৃদয় মন্থিত এক শাশ্বতকালীন নারী সত্তা। এই একটি কথা দিয়ে নারী-হৃদয়ের সমস্ত কোমলতা, স্নেহ, মাধুর্য এবং বেদনা সবই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন চণ্ডীদাস। এখানেই তাঁর ভাব ও ভাষার সহজ ও সরল আবেদন যা অন্য কোন বৈষ্ণব কবির কাব্যে অনুপস্থিত।

'নিবেদনের' পদে চণ্ডীদাসে অনন্যসুন্দর প্রকাশভঙ্গি যুগ যুগ ধরে তাঁর লেখনীকে অমর করে রাখবে। রাধা তাই কৃষ্ণকে বলেন—

বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥

বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পার্থক্য অনেক। দুই কবির কাব্যের বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ। কিন্তু ভাবের বিন্যাসে এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় মনে হয় দুই কবি দুই মেরুতে আসীন। বিদ্যাপতির কাব্যে যেখানে

অলঙ্করণ চাতুর্য, ভাষার নাগরিকত্ব এবং বর্ণনার আড়ম্বরতা প্রবল চণ্ডীদাসের কাব্যে সেই অলঙ্করণ চতুর্যতা নেই, নেই ভাষার মুন্সিয়ানা। সর্বোপরি সহজ সরল বর্ণনার এক প্রবাহমানা নদী তাঁর কাব্যকে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। বিদ্যাপতির রাধা সংস্কৃত কাব্য লক্ষণ যুক্তা কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা নিরাভরণা। বিদ্যাপতি কাব্য যেখানে আড়ম্বরের ঔজ্জ্বল্যে প্রোজ্জ্বল; চণ্ডীদাসের কাব্য সেখানে নিরলঙ্কার কিন্তু অপার্থিব শ্রীমণ্ডিত। তাই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেনঃ "বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরও গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন।··· এত গম্ভীর কথা বিদ্যাপতি কোথাও প্রকাশ করেন নাই।···বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য, বর্ণনার সৌন্দর্য আছে; কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন।"

চণ্ডীদাস এই আত্মমগ্নতার কবি। এবং তাঁর পদাবলী এই মগ্ন সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ দ্যুতিতে ভরপুর।

তৃতীয় অধ্যায়

কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়

ক. কৃত্তিবাসের রামায়ণ

আদি মধ্য যুগের অনুবাদ সাহিত্য শাখায় কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণের বাংলা অনুবাদ একটি স্মরণীয় কীর্তি। আদি কবি বাল্মিকী সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন। ভাষার কারণে এই মহাকাব্যের সার্বিক লৌকিক বিস্তার সম্ভব হয় নি। তুর্কী আক্রমণোত্তর কালে বাঙালী যখন স্বভাবনায় ভাবিত হবার জন্য আত্মমুখী হয়েছিল, ঠিক সে সময় আভিজাত্যের খোলস ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি লোক চেতনার পদপ্রান্তে আত্ম-নিবেদন করেছিল। সমাজে-উচ্চ-নীচের মধ্যে বিভেদ দূরীভূত হয়েছে। এমন পটভূমিকায় বাংলা রামায়ণের অনুবাদ কর্ম নিয়ে কৃত্তিবাসের আবির্ভাব।

কিন্তু কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকে বাঙালী পাঠকসমাজ সাদরে গ্রহণ করলেও কৃত্তিবাস বাঙালী গবেষকদের কাছে আজও প্রায় কুয়াশার মধ্যে আচ্ছন্ন আছেন। তার প্রধান কারণ কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কাল আজও প্রায় অজ্ঞাত এবং অনুমান নির্ভর। দ্বিতীয় কারণ কৃত্তিবাসের মূল রচনা কতখানি বা কোনটি তাও প্রায় অজ্ঞাত। বাংলাদেশের অপামর জনসাধারণ যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করে থাকেন সেই কাব্যের হয়ত অনেকখানিই নানা কবির রচনা; যা আজও কৃত্তিবাসের নামে চলে আসছে। কৃত্তিবাসের মূল কাব্যটি পাঁচালি আকারে লিখিত ছিল। সেই পাঁচালি কালক্রমে গায়েনদের মুখে মুখে অথবা লিপিকরদের প্রমাদের ফলে এবং কবি যশপ্রার্থী দুর্বল কবিদের দ্বারা আসল কৃত্তিবাস বহু নকলের তলায় চাপা পড়ে গেছেন। আজ আর মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। যা আছে তা প্রক্ষেপে ভরা বহু নকল কৃত্তিবাসের অক্ষম রচনায় স্বীকৃতি স্বরূপ।

তবুও কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীর চির আদরের, পরম শ্রদ্ধার এবং বাঙালী জীবনের পরম মর্যাদার মহাকাব্য। মূলের সঙ্গে এর যত পার্থক্য থাকুক না কেন অথবা অনেক অসম্ভব ঘটনা এ কাব্যের দেহভারকে ভারাক্রান্ত করলেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালী চিত্তে অক্ষয় আসন পেতে বসে আছে; সেখান থেকে তাকে সরানো কোন দিনই সম্ভব নয়। বাংলা সাহিত্যে, মনে হয়, কৃত্তিবাসের মত সমমানের অধিকারী কবি আর কেউ নেই।

এ পর্যন্ত কৃত্তিবাসের যতগুলি রামায়ণের পুঁথি পাওয়া গেছে তার মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর আত্মজীবনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। পণ্ডিত ও গবেষকগণ এই আত্মপরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নন। তবুও এই আত্মপরিচয় অংশ অবলম্বন করে কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ, জন্মবিবরণ এবং গ্রন্থ রচনার কারণ ইত্যাদি জানা যায়।

কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ থেকে এসে গঙ্গারতীরে ফুলিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পিতার নাম বনমালী ওঝা এবং মাতার নাম নলিনী। বনমালীর ছয় পুত্র ছিলেন—কৃত্তিবাস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নিজের জন্ম সম্বন্ধে কবির উক্তি—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

কবির এই জন্ম পরিচিতি যে অসম্পূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই ; কারণ এর মধ্যে কোন জন্ম সনের উল্লেখ নেই। কবি বার বৎসর বয়সে পদ্মানদী অতিক্রম করে লেখাপড়া করতে যান এবং সেখান থেকে ফিরে গৌড়েশ্বরকে তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তিতে মুগ্ধ করে সম্মানিত হন। পরে তাঁর রাজসভায় স্থায়ী আসন লাভ করেন। গৌড়েশ্বরের অনুরোধে কৃত্তিবাস শ্রীরামের পাঁচালি 'রামায়ণ' অনুবাদের কাজে হাত লাগান। কবি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন ঃ—

মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপ মায়ের আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান॥
সাতকান্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥

আত্মপরিচয় অংশে কৃত্তিবাস যে রাজার রাজসভার কথা বলেছেন সেই রাজার নামের কোন উল্লেখ নেই। ফলে, তিনি কোন রাজার রাজসভায় পুরস্কৃত হয়েছিলেন তা অনুমান নির্ভর। অনেকে মনে করেন, তিনি যে গৌড়েশ্বরের কথা বলেছেন, তিনি ছিলেন 'রাজা গণেশ'। কিন্তু কবির পক্ষে রাজা গণেশের দরবারে উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। সেজন্যে অনেকে অনুমান করেন আত্মপরিচয় অংশে কবি বর্ণিত 'গৌড়েশ্বর' কোন রাজা উপাধিধারী জমিদার হওয়াই স্বাভাবিক। নানা তথ্য প্রমাণ দ্বারা গবেষকগণ কৃত্তিবাসের আবির্ভাব কালের একটি অনুমান সূত্র খাড়া করেছেন। তাঁদের মতে কৃত্তিবাস ১৪৬০ হতে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের একটি পুঁথির লিপি সমাপ্তিকাল রূপে ১৫০২ শকের ২৫শে মাঘের উল্লেখ দেখে অনুমান করেছেন—কৃত্তিবাসের গ্রন্থ ঐ সময়ের পূর্বে রচিত হয়েছিল।

কৃত্তিবাস বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। মূল রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে অন্য অনেক কাহিনীর সংযোজন করেছিলেন। তা ছাড়া অন্যের রচনাও এর মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। তার ফলে সংস্কৃত রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসের রামায়ণের কাহিনীগত পার্থক্য অনেক। কৃত্তিবাস বাল্মীকির ক্ষত্রিয় বীর রামচন্দ্রকে 'ভক্তের ভগবান' রূপে তাঁর রামায়ণে চিত্রিত করেছেন। অনুরূপভাবে

ক্ষত্রিয়নারী সীতা বাঙালী বধূরূপে চিত্রিত হয়েছেন। কৃত্তিবাস রামায়ণের বিষয় এবং চরিত্রগুলিকে নিতান্ত বাঙালীর দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করেছিলেন। এই কারণে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তার এটি একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। এছাড়া এ কাব্যের আর একটি জনপ্রিয়তার কারণ এর ভক্তিরসে আধিক্য। শুধু তাই নয় কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্য বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিচ্ছবি। বাংলাদেশের পারিবারিক জীবনের এত সুন্দর ও নিখুঁত প্রতিচ্ছবি অন্য কোন কাব্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলার গৃহ জীবন ও বাংলার পল্লীপ্রকৃতির স্নিগ্ধ ছবি রামায়ণ মহাকাব্যের পাতায় পাতায় বিধৃত হয়ে আছে। সর্বোপরি অশ্রুমতী সীতার কাহিনী এ কাব্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তার কারণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখ, ব্যথা-বেদনার যে মিলন বিরহ চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় তা খুবই মর্মস্পর্শী। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত উত্তর পশ্চিম ভারতে হিন্দী কবি তুলসী দাসের 'রামচরিত মানস' ও জনসমাজে সমাদৃত।

যাইহোক, আগেই আলোচনা করা হয়েছে কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়নি। তার কারণ, এর পুথি বারে বারে লোকের হাতে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই বর্তমানকালে যে মুদ্রিত রামায়ণ পাওয়া যায় তার ভাষা প্রায় আধুনিককালের ভাষার মত। তবুও আদি মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্য হিসেবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ একটি অনন্যসাধারণ রচনা।

খ. মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয়

আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সে যুগের অনুবাদ সাহিত্য। কৃত্তিবাস রামায়ণের অনুবাদ করে জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃত মহাকাব্যের রস বিতরণ করেছিলেন। এ সবই হয়েছিল তুর্কী আক্রমণের পরবর্তীকালে বাঙালীর আত্মমুখীনতার জন্য। সমাজের উচ্চবর্ণ এবং নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের পরিমণ্ডল রচনার প্রয়োজন হয়েছিল। ঠিক সেই কারণেই নিম্নবর্ণের মানুষদের হাতে রামায়ণ ও ভাগবতের রসসম্ভার তুলে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। রামায়ণ যেমন রাম ও সীতার কাহিনী অবলম্বনে রচিত; সংস্কৃত কাব্য ভাগবত তেমনি কৃষ্ণ কথা বিষয়ক সংস্কৃত কাব্য। যুগের প্রয়োজনে এবং সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য রামায়ণের মত ভাগবতেরও অনুবাদ করা হয়েছিল।

মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ কাব্যের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।' এই যুগের অন্যান্য কবির মত মালাধর বসুরও কোনও সঠিক জন্ম সময়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মালাধর বসুর জন্মস্থান বর্ধমান জেলার মেমারির নিকট কুলীন গ্রাম নামক স্থানে। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ বসু এবং মাতার নাম ইন্দুমতী। পুত্রের নাম ছিল সত্যরাজ খান। সত্যরাজ খান এবং তার পুত্র রামানন্দ বসু দু'জনেই মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। মালাধর বসুর জন্ম সালের উল্লেখ না

পাওয়া গেলেও তাঁর পৌত্র চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। এই তথ্য থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৪২০-১৪২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' বাংলা সাহিত্যের সন-তারিখ যুক্ত প্রাচীনতম গ্রন্থ। গ্রন্থমধ্যে কবির গ্রন্থ রচনার কাল-জ্ঞাপক একটি শ্লোক আছে ঃ

"তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন॥

এই কাল পরিচয় জ্ঞাপক শ্লোকটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় গ্রন্থখানির রচনাকাল দুই পাঠান সুলতান রুকুনুদ্দীন বরবাক শাহ (১৪৬০—১৪৭৪ খ্রীঃ) এবং সামসুদ্দীন ইউসুফশাহের (১৪৭৪—১৪৮১ খ্রীঃ) রাজত্বকালের মধ্যে বিস্তৃত। কবি নিজে গ্রন্থের ভূমিকায় এবং গ্রন্থ মধ্যে প্রায় সর্বত্র ভণিতা হিসেবে নিজেকে 'গুণরাজ খান' এই উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন ঃ

"গুণ নাই, অধম মুই, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥"

অনেকের মতে তাঁর কাব্যে উল্লিখিত এই 'গৌড়েশ্বর' হচ্ছেন সামসুদ্দীন ইউসুফশাহ। তবে মনে হয় এই দুই সুলতানের কোন একজন তাঁকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কবি গ্রন্থ রচনার কারণ সম্বন্ধে বলেছেন ঃ—

ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোকে নিস্তারিতে করি পাঁচালি রচিয়া॥
ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে।
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিকের মতে॥

অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের 'লৌকিক' বিস্তারের জন্যই তিনি এই কাব্যের বঙ্গানুবাদে হাত দেন। মালাধর বসু তাঁর কাব্যে সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ করেন নি ; কেবলমাত্র মূল গ্রন্থের দশম-একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর কাব্যখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত ঃ

১. আদ্য কাহিনী অর্থাৎ বৃন্দাবন লীলা।
২. মধ্য কাহিনী অর্থাৎ মথুরালীলা।
৩. অন্ত্য কাহিনী অর্থাৎ দ্বারকালীলা।

আদ্য কাহিনীতে কৃষ্ণের জন্মের কারণ হতে মথুরা যাত্রা পর্যন্ত ; মধ্য কাহিনীতে কৃষ্ণ-বলরামের মথুরায় উপস্থিতি এবং দ্বারকাপুরী স্থাপনের সিদ্ধান্ত এবং অন্ত্য কাহিনীতে কৃষ্ণের জরা ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এক হিসেবে মালাধর বসু ভাগবতের অনুবাদ কার্যে কৃষ্ণজীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। মালাধর বসু সংস্কৃত ভাগবতের

পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ করেন নি। মূল ভাগবতের তত্ত্বকথার অংশকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করে আখ্যান ভাগকে বর্ধিত করে বর্ণনা করেছেন। মনে হয় সেই কারণেই তিনি মূল অংশের কিছু পরিবর্তন করেছেন। কোথাও কোথাও অতিরিক্ত কাহিনী অনুবাদে যোগ করেছেন। অতিরিক্ত কাহিনী সংযোজনের ক্ষেত্রে মনে হয় তিনি বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ হতে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে মনে হয় তিনি নিজেও কাহিনী সংযোজন করেছেন। মূল ভাগবতে 'রাধা' নামের উল্লেখ নেই। মালাধর বসুর নামাঙ্কিত অনেক পুঁথিতে 'দানখণ্ড' এবং 'নৌকাখণ্ডের' অ-পৌরাণিক লীলার কথা মুদ্রিত আছে। কিন্তু মুদ্রিত সংস্করণে এই উল্লেখ অনুপস্থিত। মনে হয় 'রাধা' সংক্রান্ত অংশটি প্রক্ষিপ্ত।

মালাধরের কাব্যের নামের সঙ্গে 'বিজয়' শব্দটি যুক্ত থাকার কেউ কেউ বিজয় শব্দের অর্থ 'মৃত্যু' অথবা 'যাত্রা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে অনুমান করেন। মালাধর বসুর কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের বীরত্ব ও বীর্যময় সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে 'বিজয়' শব্দটিকে অনেকে 'বিজয় যাত্রা' অর্থে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যের বিজয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবন-বৃত্তান্ত। বাংলাদেশে কৃষ্ণভক্তির দু'টি ধারা প্রবাহমান। এক· কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপ এবং দুই· কৃষ্ণের মাধুর্য রূপ। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের রূপেরই বর্ণনা বেশি।

চৈতন্যদেব মালাধরের কাব্যের রসাস্বাদন করেছিলেন এবং তিনি এই কাব্যের প্রশংসাও করেছেন। অনুবাদ কাজে কবি মৌলিকত্বের স্থান না থাকলেও বৃন্দাবন-লীলা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। গোপীদের শোক উল্লেখপর্বে মর্মস্পর্শী করুণ রসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নের উদ্ধৃতি হতে তা উপলব্ধি করা যাবে ঃ

কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কিবা কাজ।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে মৈলে কৃষ্ণ পাবে লাজ॥
অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে॥

'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্যের ভাব ও ভাষা খুবই সহজ এবং সরল। সমগ্র কাব্যখানি সরল পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লেখা। কাব্যের দার্শনিক অংশ তিনি প্রায় বর্জন করেছেন। কাব্যখানি খুব জনপ্রিয় হওয়ায় মনে হয়, পরবর্তী কবি ও নকলকারদের হাতে এর ভাব ও ভাষার বহু পরিবর্তন ঘটেছে। সেজন্যে বর্তমান পুঁথিগুলিতে এর ভাষার বিশুদ্ধতা যে রক্ষিত হয় নি তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা হতে অল্প উদ্ধৃতি দেওয়া হলো ঃ

রজনী প্রভাতে হৈল রাম দামোদরে।
বাছুর লইয়া যান যমুনার তীরে॥
ভোজন করিয়া সবে সিঙ্গা বাজাইয়া।
পাছু যায় শিশুগণ বৎস চালাইয়া॥

একত্র লইয়া সবে যমুনার তীরে।
নানা বিধ জলক্রীড়া করে ধীরে ধীরে ॥

কৃত্তিবাসের মত মালাধরের কাব্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই কাব্যের বাঙালিয়ানা। যদিও ভাগবতের এই কাহিনীর স্থান উত্তর ভারত, তবুও মালাধরের লেখনী চাতুর্যে এ কাব্যের আঙ্গিক সম্পূর্ণ বাংলাদেশের। বৃন্দাবনলীলার বর্ণনায় মালাধর বাংলাদেশের মেঘমেদুর চিত্রের ছায়াঘন রূপ কাব্যের মধ্যে বিস্তার করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একটি সুন্দর চিত্র তাঁর কাব্যে আভাসিত।

এইসব দিক থেকে বিচার করলে মালাধরের কাব্য যে বাঙালীর কাছে খুবই সমাদর লাভ করেছিল তা অনুধাবন করা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য গীত হতো। অনুবাদের সময় কবি তাই একে গীতযোগ্য করেই রচনা করেছেন এবং কৃষ্ণভক্তি রস সম্প্রসারণে সহযোগিতা করেছেন। সমকালীন বাংলাসাহিত্যে তাই শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য একটি শ্রেষ্ঠ সংযোজন।

মঙ্গল কাব্য

চতুর্থ অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ ও মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সামাজিক জীবন

ক. মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ

'মঙ্গল' শব্দের অর্থ কল্যাণ। মধ্যযুগের কাব্যের নামের সঙ্গে 'মঙ্গল' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় 'মঙ্গলকাব্য' শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। কাব্যের নামের সঙ্গে 'মঙ্গল' শব্দটি যুক্ত হওয়ার অনেক কারণ থাকলেও মনে হয় প্রধান এবং সঙ্গত কারণ আর্য ও অন-আর্য সংস্কৃতির মিলনের ফলে অন-আর্য দেব দেবী আর্য সমাজে ঠাঁই পেয়েছিলেন। এই সব দেব দেবীকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দান করার জন্য জন মানসে একটি বাতাবরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে সে যুগের উচ্চ সম্প্রদায়ের কবিগণ আর্য সম্প্রদায়ভুক্ত অন-আর্য দেব-দেবী গণের পূজা প্রচারের জন্য তাঁদের নামের শেষে মঙ্গল শব্দটি যুক্ত করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ এই সব দেব-দেবীর কথা শুনলে বা জানলে মঙ্গল অনিবার্য।

গবেষকগণ মঙ্গল শব্দ ব্যবহারের পক্ষে অবশ্য আরও কারণ নির্দেশ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেছেন এই যুগের মঙ্গলকাব্যগুলি পালাগান হিসেবে গীত হত এবং এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হয়ে অন্য মঙ্গল বার পর্যন্ত এই পালাগান চলত। তাই এই কাব্যগুলির নাম হয়েছে মঙ্গলকাব্য।

আবার কেউ কেউ বলেছেন এই কাব্য পাঠ করলে বা শুনলে শ্রোতাদের এবং পাঠকের মঙ্গল হবে ; বৃহত্তর অর্থে সমস্ত বিপদ হতে মুক্তি হবে। মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে একটি অস্থিরতা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। এই অস্থিরতার শিকার হয়েছিল সে যুগের সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের মন থেকে সেই অস্থিরতা দূর করার আর কোন উপায় সে যুগের শাসকদের হাতে ছিল না। মানুষের মধ্যে দৈব নির্ভরতা ধীরে ধীরে ঠাঁই পাচ্ছিল। ঠিক এমনি পটভূমিকায় অস্থির মানসিকতাকে শান্ত এবং সুসংহত করার জন্য মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

এ ছাড়া সমসাময়িক কালের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হবে।

বাংলা মঙ্গল কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে। এই সময়টিতে বাংলা দেশে মুসলমান শাসন কায়েম ছিল। বিদেশীদের শাসনাধীনে থাকার ফলে দেশবাসীর মনে একদিকে যেমন ছিল গ্লানি তেমনি অন্যদিকে ছিল অত্যাচার এবং শোষণের ভীতি।

মুসলমান শাসনের আগের অবস্থাটিও ভাববার বিষয়। কারণ আর্যদের কাছে বাংলাদেশ এবং তার অধিবাসীরা ছিল 'ব্রাত্য'। মৌর্য, গুপ্ত এবং আরও পরে সেন রাজাদের সময়ে ধীরে ধীরে আর্য ও অন-আর্যদের মিলন ঘটছিল। কিন্তু মিলন ঘটলেও তথাকথিত অনার্যরা আর্যদের কাছে নিম্নশ্রেণীর অস্পৃশ্যরূপেই পরিগণিত হতো। সামাজিক এই অবহেলার ফলে দুই শ্রেণীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব পরপর বেড়ে চলেছিল। সমাজের যখন এমন অবস্থা তখনই হঠাৎ ঝড়ের মত অপ্রত্যাশিত তুর্কী আক্রমন বাঙালীর জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। তখন আবার বাধ্য হয়ে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সমাজের সাধারণ শ্রেণীর সমতলে নেমে এসেছিল। উদ্দেশ্য ছিল বাঙালীর শক্তি বৃদ্ধি করা এবং জাতির আত্মশক্তি দৃঢ় করা। সমাজে সাধারণ শ্রেণীর প্রতি অভিজাত শ্রেণীর উন্নাসিকতা কিছু কমতে আরম্ভ করলো। আবার পারস্পরিক সাংস্কৃতিক সংযোগ শুরু হলো। এই সংস্কৃতি বিনিময়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের মানুষদের আরাধ্য দেব দেবীর পূজা, স্তব-স্তুতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের লোকেরা গ্রহণ করলো। ঠিক এমনি পটভূমিকায় এবং সামাজিক কারণে মঙ্গলকাব্যের জন্ম হলো।

তুর্কী আক্রমণের পরোক্ষ ফল হিসেবে বাঙালীর এই সাহিত্য সাধনার মূলে ছিল সে যুগের সমাজ ব্যবস্থা। আগেই বলা হয়েছে—এ যুগের মানুষের মনে ধীরে ধীরে দৈব নির্ভরতা বেড়ে উঠছিল। এই দৈব নির্ভরতার কারণ সাধারণ মানুষ শাসক শক্তির কাছে যেমন শোষিত ও অত্যাচারিত হচ্ছিল সমাজের উচ্চশ্রেণীর কাছ থেকেও তেমনি অবহেলিত হচ্ছিল। এই দুই কারণে সাধারণ মানুষ তাঁদের কল্পিত দেব দেবীর কাছে শক্তি ভিক্ষার জন্য বার-ব্রত-পূজা ও অর্চনায় আত্মনিয়োগ করেছিল। এই কারণেই মঙ্গলকাব্যগুলিতে মানব মহিমা দেব-দেবীর নিকট খর্ব হয়েছে এবং দৈব-নির্ভরতা বেড়েছে।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দেব দেবীরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সমাদর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এই সব দেব-দেবীর গায়ে পৌরাণিক প্রলেপ দেওয়া আরম্ভ করেন। তাই মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যায় দেবখণ্ড এবং নরখণ্ডের বিভাগ এবং দেবখণ্ডে নানা দেব দেবীর স্তুতি ও প্রশস্তি। অন-আর্য দেবতা শিব এবং দেবী চণ্ডী, মনসা এঁরা সকলেই পৌরাণিক মাণ্ডানিকতায় সমাজে ধীরে ধীরে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের কাছে পূজা পেতে লাগলেন। সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই দেব-দেবীর পূজা ও অর্চনার ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গেল। সামাজিক সমন্বয়কে দৃঢ় করার জন্য, বিদেশী

শক্তির প্রতিরোধ করার ভবিষ্যৎ প্রস্তুতির জন্য সে যুগের বাঙালী উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে যে সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেছিল তা হচ্ছে এই মঙ্গলকাব্য। অন-আর্য দেব-দেবীকে যেন কোন মতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অবহেলা না করে এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছ থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা যাতে দূরে সরে না যায় তারই মিলন সেতু রচনার জন্য দেব দেবী বিষয়ক এই সব কাব্যগুলিতে 'মঙ্গল' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য তোমার মঙ্গল, আমার মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল এবং সমগ্র নবগঠিত বাঙালী জাতির মঙ্গল।

খ. মঙ্গল কাব্যে তৎকালীন সামাজিক জীবন।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি সমাজ জীবনের নির্ভরযোগ্য দলিল। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে তৎকালীন যুগের সমাজ জীবনের নানা খুঁটিনাটি চিত্র। সে যুগের বাঙালীর জন্ম ও মৃত্যু, বিবাহ ও অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান ; সামাজিক জীবনের নানা বিধি-নিষেধ, কৃষি-ব্যবসা-বাণিজ্য, নগর পত্তন, ভোজনপর্ব ও খাদ্যতালিকা এমন কি দৈনন্দিন জীবন চর্যার নিখুঁত বর্ণনা এই কাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। এই দিক থেকে মঙ্গলকাব্যগুলিকে সে যুগের বাঙ্গালী সমাজের দর্পণ বলা যেতে পারে।

মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র বাঙালী জীবনের ছবি শিব-পার্বতীর সংসার জীবন অবলম্বন করে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। কৃষি নির্ভর বাঙালী জীবনে দুঃখ-দৈন্যের কথা শিব-পার্বতীর সংসার যাত্রা হতে ভাল ভাবে জানা যায়। অন্যদিকে অন্ত্যজ ব্যাধ শ্রেণীর দারিদ্র্য প্রপীড়িত জীবন যাত্রার বেদনাঘন চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় কালকেতু ফুল্লরার উপাখ্যানে।

সে যুগের সমাজে সপত্নী পীড়া যে কিরূপ দুঃখের কারণ ছিল তার প্রমাণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সুন্দর ভাবে বিধৃত হয়েছে। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যেমন বিভেদ ছিল তেমনি বিভেদ ছিল ব্রাহ্মণ ও অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে। ব্রাহ্মণরা যদিও বর্ণশ্রেষ্ঠ ছিল তবে সমাজের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ছিল সদাগর বণিক সম্প্রদায়। মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই বণিক সম্প্রদায়ের আর্থিক কৌলিন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগের নৌ-বাণিজ্যের চিত্রটিও ধরা পড়ে এই কাব্য দুটিতে।

সমাজে উচ্চবর্ণের মহিলাদের স্বাধীনতা ছিল না ; তবে নিম্নবর্ণের মহিলাদের যত্রতত্র যাওয়ার এবং হাটে বাজারে পশরা নিয়ে উপস্থিত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। কালকেতুর স্ত্রী ফুল্লরার চরিত্রে তা দেখা যায়। শুধু তাই না মহিলারা স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারতেন না। তার প্রমাণ আছে মনসামঙ্গল কাব্যে সনকার মনসাপূজা করার ব্যাপারে। চাঁদ সদাগর স্ত্রীর মনসাপূজার ঘট

পা দিয়ে উল্টে দিয়েছেন। অনুরূপ চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতির উপাখ্যানে।

নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা মনসা অথবা চণ্ডীর পূজা করলেও উচ্চবিত্তের মানুষেরা শিবের উপাসক ছিলেন। বিবাহ উপলক্ষ্যে মহিলারা নানা রকম স্ত্রী আচার পালন করতেন, বাসরঘরে রাত জাগতেন। স্বামীদের নানা ব্যাঞ্জন রান্না করে তাঁদের রসনা তৃপ্ত করতেন। তাঁরা নানাবিধ গহণা পরতেন এবং উত্তমভাবে কেশ চর্চা করতেন। ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল কাব্যে পুত্র কামনায় নানা অনুষ্ঠান ও ব্রত উদ্‌যাপনের উল্লেখ আছে। মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁকে সে যুগের পুরুষ ও নারী দুইই বিশ্বাসী ছিলেন।

সমাজে বিদ্যাচর্চা ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগের সমাজ ব্যবস্থায় বৃত্তি অনুযায়ী সামাজিক বিভাগ ছিল। কালকেতুর নগর পত্তন অংশে তার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে ব্যবসায়ীরা ধূর্ত ছিল—সুযোগ পেলে লোক ঠকাত। চণ্ডীমঙ্গলে মুরারি শীল তার পরিচয়।

প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে দেখা যায় শাসকগোষ্ঠী অত্যাচারী ছিল। এটি সে যুগের ইতিহাসের প্রতিফলন। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী নিজেই শাসকের দ্বারা তাঁর গ্রাম থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। কালকেতুর আখ্যানে দেবী চণ্ডীর কাছে পশুদের আবেদন অংশেও তা প্রতিফলিত।

সমাজে হিন্দু মুসলমান বাস করতো কিন্তু তাদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছিল না ; যদিও মুসলমান শাসকেরা অত্যাচারী ছিল।

ডোম জাতি খুবই যুদ্ধপ্রিয় ছিল। ধর্মমঙ্গল কাব্যে তাদের যুদ্ধের কথা আছে ; সেই সঙ্গে অমিত তেজ ও বীরত্বের উল্লেখ আছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর মধ্যে রাঢ় বঙ্গের জীবন যাত্রা এবং অতীতে বাঙালীর শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এইসব দিক হতে বিচার করলে দেখা যায় যে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি বাঙালীর জাতীয় জীবনের নির্ভরযোগ্য প্রতিচ্ছবি।

মনসা মঙ্গল

পঞ্চম অধ্যায়

মনসা মঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী
মনসা মঙ্গল কাব্যের তিন মুখ্য কবির পরিচয়

ক. মনসা মঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

মনসামঙ্গলের কাহিনী দু'ভাগে বিভক্তঃ দেবখণ্ড ও নরখণ্ড। দেবখণ্ডে প্রধানত মনসার জন্ম এবং স্বর্গের অন্যান্য দেবদেবীর কথা উল্লেখ আছে। নরখণ্ডে মনসার মর্ত্যে আগমন এবং নিজের পূজা প্রচারের কথা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। মনসামঙ্গলের কবিরা মনসার কাহিনী তাঁদের কাব্যে অল্পবিস্তর এদিক ওদিক করে বর্ণনা করলেও মূল কাহিনীর ধারাটি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

দেবীমনসা শিবের মানসকন্যা। সেজন্যে তাঁর নাম মনসা। পদ্মপত্রে তাঁর জন্ম বলে তাঁর আর এক নাম পদ্মা। কেউ কেউ কেয়া পাতায় জন্ম বলে মনসাকে 'কেতকা' নামেও অভিহিত করেছেন। কন্যার জন্মের পর মনসাকে মহাদেব কৈলাসে নিয়ে গেলে সেখানে বিমাতা চণ্ডীর সঙ্গে কলহের ফলে তাঁর এক চক্ষু কানা হয়ে যায়। যার ফলে মনসাকে 'চ্যাংমুড়ী কানি' বলে চাঁদ সদাগর গালাগাল দিয়েছেন। জরৎকার মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়েছিল; কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয় নি। তাঁর পুত্রের নাম 'আস্তিক'। স্বামী পুত্রকে ছেড়ে তিনি জয়ন্তী নগরীতে একা বসবাস করতে থাকেন। মনসামঙ্গল কাব্যের দেবখণ্ডের কাহিনী এখানেই সমাপ্ত।

নরখণ্ডে দেবীমনসা মর্ত্যে নিজের পূজা প্রচারের জন্য খুবই সচেষ্ট। মনসার স্বভাব এমনিতেই ক্রুর এবং খল। নিজের পূজা প্রচার করতে গিয়ে তাঁর এই স্বভাবের পরিচয় বার বার দিয়েছেন। প্রথমেই তিনি সমাজের নীচুতলার লোকদের মধ্যে নিজের পূজা প্রচারে সচেষ্ট হয়ে কিছু অংশে সফল হলেও সমাজের অভিজাত মানুষদের কাছে তিনি কিছুতেই প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিলেন না। সে সময়ে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন বণিকেরা। চাঁদ সদাগর এমনি একজন সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় বণিক। মনসা চাঁদ সদাগরের দ্বারা নিজের পূজা প্রচারে উদ্যোগী হন। কিন্তু চাঁদ ছিলেন শৈব। তিনি কিছুতেই মনসার পূজায় রাজী হলেন না। মনসার এক সহচরী ছিলেন; তাঁর নাম নেতা। নেতা কৌশলে চাঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে তাঁর পত্নী সনকাকে মনসার পূজা করার জন্য রাজী করায়। অন্তঃপুরে সনকা একদিন যখন মনসার পূজা অর্চনা করছিলেন সে সময় চাঁদ সেখানে উপস্থিত হন। এবং মনসার পূজা দেখে তিনি ক্রোধে মনসার ঘট ভেঙে পূজার আয়োজন

লণ্ড ভণ্ড করে দেন। এই ঘটনায় মনসা চাঁদের উপর ক্রুদ্ধ হলেন এবং নানা কৌশলে চাঁদকে বিপদে ফেলতে লাগলেন। তিনি চাঁদের বাগান নষ্ট করলেন; তাঁর মহাজ্ঞান হরণ করলেন, চাঁদের বন্ধু ধনন্তরি শঙ্কর গাড়ুড়ির এবং শেষে একে একে ছয়পুত্রের মৃত্যু ঘটালেন। এত বিপদেও চাঁদ কিছুতেই এই অখ্যাত নারী দেবীর পূজা করতে রাজী হলেন না। সনকার দুঃখ, বেদনা এবং আর্তক্রন্দনও চাঁদকে কিছুতেই টলাতে পারলেন না।

বণিকের পক্ষে বাড়ি বসে থাকা সম্ভব নয়। শোকসন্তপ্ত চন্দ্রধর 'সপ্তডিঙা মধুকর' ভাসিয়ে বাণিজ্যে গেলেন। নানা দেশ ঘুরে বাণিজ্য শেষে দেশে ফেরার পথে মনসা বাদ সাধলেন। তিনি পথে প্রবল ঝড় বৃষ্টি সৃষ্টি করে তাঁর 'সপ্তডিঙা মধুকর' জলে ডুবিয়ে দিলেন। অসহায় চাঁদ সমুদ্রের জলে যখন হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তখন মনসা তাঁর সম্মুখে একটি পদ্ম ফেলে দিলেন। চাঁদ অসহায়ের সম্বল হিসেবে পদ্ম ধরতে গিয়েও ধরলেন না কারণ মনসার আর এক নাম পদ্মা। চাঁদ মনোবল না হারিয়ে বহু ক্লেশ বরণ করে, শ্মশান থেকে কাপড় সংগ্রহ করে এবং মানুষের কাছে নানাভাবে নিগৃহিত হয়ে অবশেষে নিজের বাড়ি পৌঁছালেন। সনকা হত-সর্বস্ব ও দুর্দশাগ্রস্ত চাঁদকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেন নি। চিনতে পেরে তিনি হাহা করে কেঁদে উঠলেন।

এদিকে চাঁদ বাণিজ্যে যাওয়ার দু'মাস পরে তাঁর সপ্তম পুত্রের জন্ম হয়েছিল। পুত্রের নাম লক্ষীন্দর। সুন্দর দেবকান্তি পুত্র সকলের নয়নমণি। ছয় ছেলে আগেই মারা গেছে। তাই, এই পুত্রের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের চিন্তার শেষ নেই। চাঁদ অনেক দেখে শুনে ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য মনের মত মেয়ে পেলেন উজানী নগরে। সায়বেনের মেয়ে, তার নাম বেহুলা। মেয়েটির যেমন রূপ তেমন গুণ। তা'ছাড়া নাচ গানে খুব পটু। আসলে লক্ষীন্দর এবং বেহুলা স্বর্গের শাপভ্রষ্ঠা অনিরুদ্ধ ও ঊষা।

যাই হোক চাঁদ আগে থেকে অনুমান করেছিলেন মনসা তাঁর সপ্তম পুত্রেরও প্রাণহাণি ঘটাতে পারে। তাই তিনি বিবাহের পূর্বে লোহার বাসরঘর নির্মাণ করলেন; একচুল প্রমাণ রন্ধ্র কোথাও রাখলেন না। বিবাহের পর বরকনে সেই বাসরঘরে প্রবেশ করল। বাসরের বাইরে প্রহরী রইলো সাপের শত্রু নেউল, ময়ূর ইত্যাদি। স্বয়ং চাঁদ সদগার বিরাট এক হেঁতালের লাঠি কাঁধে করে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। বাসরঘরে লক্ষীন্দরের খুব খিদে পেল। বেহুলা নারকেলের জলে বরণডালার চাল ফুটিয়ে ভাত রান্না করে লক্ষীন্দরকে খেতে দিলেন। লক্ষীন্দর ঘুমিয়ে পড়লে বেহুলা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে জেগে রইলেন। এদিকে মনসার চর এক এক করে আসে আর জাগ্রত বেহুলাকে দেখে ফিরে যায়। শেষ রাতে বেহুলা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। মনসা তখন কালনাগিনীকে পাঠায়। লোহার বাসরে মনসার চক্রান্তে সুতোর মত অল্প ফাঁক

ছিল। কালনাগিনী সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করে লক্ষীন্দরকে দংশন করে। লক্ষীন্দর বেহ্লাকে ডেকে বলে ঃ

জাগ ওহে বেহ্লা সায়বেনের ঝি।
তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি॥

লক্ষীন্দরের ডাকে বেহ্লা জেগে উঠে দেখলেন তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। লক্ষীন্দর কালনিদ্রায় শায়িত। বেহ্লা ক্রন্দন করে উঠলেন। তাঁর ক্রন্দনে সকলে জেগে উঠল। সনকা তাকে অনেক কটু কথা বললেন সেই সঙ্গে নিজের স্বামীকেও অনেক দুর্বাক্য বললেন। বেহ্লা নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে কলার ভেলায় নিজের স্বামীর মৃতদেহ সাজিয়ে নিয়ে গাঙ্গুড় নদীতে ভাসলেন ; প্রতিজ্ঞা করলেন স্বামীকে না বাঁচিয়ে ফিরবেন না।

পথে নানা বিপদ, প্রলোভন ইত্যাদি সহ্য করে অবশেষে স্বামীর গলিতশব নিয়ে উপস্থিত হলেন মনসার সহচরী নেতা ধোপানীর ঘাটে। নেতা স্বর্গের দেবতাদের কাপড় কাচতো। নেতাকে বেহ্লা নানাভাবে সন্তুষ্ট করে উপস্থিত হলেন স্বর্গের দেবসভায়। সেখানে শোক সন্তপ্ত বেহ্লা তাঁর নৃত্য দেখিয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করলেন এবং তাঁদের অনুরোধে মনসা বেহ্লার মৃত পতির প্রাণ সঞ্চার করলেন। লক্ষীন্দরের আরও ছয় ভাইয়েরও প্রাণ সঞ্চারিত হলো। চাঁদের 'সপ্তডিঙা মধুকর' আবার তার পূর্ণ পণ্য সম্ভার নিয়ে জলে ভেসে উঠলো। চাঁদকে এবারে মনসার পূজা করার জন্য অনুরোধ করা হল ; কিন্তু চাঁদ রাজী হলেন না। তাঁর মতে—

যেই হস্তে পূজিয়াছি দেব শূলপাণি।
সেই হস্তে না পূজিব চেংমুড়ী কানী॥

অবশেষে চাঁদের এই দৃঢ়তা নমনীয় হলো সনকার আত্মহত্যার বাসনায় এবং বেহ্লার পুনরায় গাঙ্গুড়ের জলে ভেসে যাওয়ার ইচ্ছায়। মানবিক স্নেহ ভালবাসায় কাতর হয়ে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের উজ্জ্বল পুরুষাকার চন্দ্রধর কোন মতে পেছনে ফিরে বাম হাতে একটি ফুল মনসার ঘটের দিকে ছুঁড়ে দিতে চাইলেন। তাতেই মনসা খুশি। সমাপ্ত হলো নরখণ্ডের কাহিনী। এইভাবেই মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচলিত হলো এবং মনসা সমাজে দেবী চন্ডী এবং দেবতা শিবের মত প্রতিষ্ঠা পেলেন। মনসা পূজা পেলেন বটে তবে এই কাব্যে মানবশক্তির জয় ঘোষিত হলো। বেহ্লা ও লক্ষীন্দর মর্ত্যে তাঁদের মানবলীলা শেষ করে আবার স্বর্গে চলে গেলেন।

ঘ. মনসা মঙ্গল কাব্যের তিন মুখ্য কবির পরিচয়

১. বিজয় গুপ্ত

বিজয় গুপ্ত মনসা মঙ্গলের অন্যতম কবি। তাঁর কাব্যে তাঁর আত্মপরিচয় অংশ হতে জানা যায় তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। বর্তমান বাংলা দেশের বরিশাল জেলার

গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। তাঁর পিতার নাম সনাতন এবং মাতার নাম ছিল রুক্মিণী। কবির নিজের গ্রামে মনসার মূর্তি স্থাপন করেছিলেন এবং শোনা যায় আজও উক্ত গ্রামে সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কবি তাঁর কাব্যে তাঁর গ্রাম সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ—

মুল্লুক ফাতেয়াবাদ বাঙ্গারোড়া তক্সিম ॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘন্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥
চারিবেদ ধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল।
বৈদ্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্রেতে কুশল ॥
কায়স্থ জাতি বাস তথা লিখনের শূর।
অন্য জাতি বসে নিজ শাস্ত্রে সুচতুর ॥
স্থান গুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়।

কবির কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে তাঁর কাব্যের মুদ্রিত পুঁথিতে নিম্নলিখিত সময়ের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ

ঋতু শূন্য বেদশশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন সাহা নৃপতি তিলক ॥

উপরোক্ত কালজ্ঞাপক উদ্ধৃতি হতে জানা যায় তাঁর গ্রন্থ রচনার সময় ১৪০৬ শক। কিন্তু পরবর্তী লাইনে উল্লেখ আছে তিনি গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের রাজত্বকালে কাব্য রচনা করেছিলেন। হুসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩—১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। হয়ত লিপিকরদের প্রমাদের জন্য এমন গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিজয় গুপ্তের অন্য এক পুঁথিতে নিম্নরূপ সময়ের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ

"ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।"

এই ছত্রের কাল বিচার করলে দাঁড়ায় ১৪১৬ শক অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময় হুসেন সাহের রাজত্বকালের অন্তর্গত। মনে হয় এই পাঠটি ঠিক এবং এটি ঠিক ধরা হলে বিজয় গুপ্তের কাব্যের রচনাকাল দাঁড়ায় ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

বিজয় গুপ্তের কাব্যের নাম 'পদ্মাপুরাণ'। তিনি সংস্কৃত বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কাব্যে গভীরতা ছাড়া পাণ্ডিত্যের প্রকাশ বেশি। ছন্দ অলঙ্কার ইত্যাদির কলাকৌশল তাঁর কাব্যে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। তিনি যে যুগ সন্ধিক্ষণের একটি বিশেষ সময়ে এই কাব্য রচনা করেছিলেন তার প্রমাণও তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। অনেক বিষয়ের বাস্তব বর্ণনা তাঁর কাব্যকে বিশেষত্ব দান করেছে। লক্ষীন্দরের মৃত্যুর পর লোহার বাসর ঘরে বেহুলার বিলাপ অংশটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

বাও নাই বাতাস নাই লোহার ঘরে বাস।
কোন নাগিনী আসি প্রভুরে কৈল নাশ ॥

এ নব যৌবন আমার গেল ছার খার।
কপাল চিরিয়া দেখি কিবা আছে আর॥

বাস্তব বর্ণনার খুঁটিনাটি ছাড়া তাঁর কাব্যে বাচনভঙ্গীর মধ্যে বাক্‌ বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

অতি কোপে করিলে কাজ ঠেকে আথান্তর।
অতি বড় গাঙ্গ হইলে ঝাটে পড়ে চর॥

করুণ রসের বর্ণনায় বিজয় গুপ্তের কৃতিত্ব কম নয়। লক্ষীন্দরের মৃত্যুর পর সনকার আর্তি ও হাহাকার খুবই বাস্তব রস সম্মত। লক্ষীন্দরের মৃত্যুতে চাঁদ সদাগরের আর্তি—

"কোথা লখাই কোথা লখাই বলে সদাগর।
চম্পকের রাজা আমার বালা লক্ষীন্দর॥" এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বিজয় গুপ্তের হাস্য রসের বর্ণনায় যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। যেমন—

সকল গুণ আছে গোদার দোষ একখানি।
দারুণ জ্বর পাইলে ছাড়ে ভাত পানি॥
চট ভুটি মুড়ি দিয়া রৌদ্রে পড়ে থাকে।
অতি কষ্ট হলে মাউগেরে মা ডাকে॥

অথবা

হাসি বলে শূলপাণি এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি,
মধ্যে দাঁড়াব নেংটা হইয়া।
দেখিয়া আমার ঠান এয়োর উড়িবে প্রাণ,
লাজে সব যাবে পালাইয়া॥

বিজয় গুপ্ত তাঁর পরবর্তী কবি কানা হরিদত্তকে 'মূর্খ' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন তা হচ্ছে কাব্যের মধ্যে সংগীতের অভাব এবং রচনার মধ্যে ছন্দ অলংকারের পরিপাট্য নেই। ছন্দ এবং অলংকারের পরিপাট্য বিজয়গুপ্তের কাব্যে সমধিক তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

পঞ্চদশ শতকের অন্য এক মনসামঙ্গল কাব্যের কবি নারায়ণ দেব। নারায়ণ দেবের সঙ্গে বিজয়গুপ্তের কিছু কিছু ক্ষেত্রে তুলনা করা হয়ে থকে। নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদের চরিত্রের মধ্যে পুরুষকারের দীপ্ত প্রকাশ দেখা যায় কিন্তু বিজয় গুপ্ত কাব্যের শেষে ঘটা করে চাঁদকে দিয়ে দেবী মনসার পূজা করিয়েছেন। নারায়ণদেবের অন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাহিনী বিন্যাস এবং চরিত্রের ক্ষেত্রে তিনি সমান

ঐক্য বজায় রেখেছেন। অন্যদিকে বিজয়গুপ্ত কাহিনী ও চরিত্রের সামগ্রিক ঐক্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বৈচিত্র্যের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন। তবে মনসার খল স্বভাবকে বিজয়গুপ্ত নানাভাবে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তবানুগ করে তুলেছেন। বিজয়গুপ্তের কাব্যে ভাবের গভীরতার অভাব থাকলেও মানব-প্রীতির অভাব নেই। বিজয়গুপ্ত অনেকাংশে সমাজ সচেতন কবি ছিলেন। মনে হয় এই সচেতনতাবোধ থেকেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সাধারণ মানুষ দেবতাকে ভক্তি করে এবং ভয়ও করে; দেবতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় না। এই কারণেই বুঝি তিনি চাঁদকে নমনীয় চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

২. নারায়ণ দেব

মনসামঙ্গলের প্রাচীন কবিদের মধ্যে নারায়ণ দেবই অন্যতম। বিজয়গুপ্তের চেয়ে তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তা বেশি। ইনিও পঞ্চদশ শতকের কবি ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। অনেকে তাঁকে ষোড়শ শতকের কবি বলে অনুমান করেন। এই অনুমানের কারণ—তাঁর কোন পুঁথিতে কাব্য রচনার সময়ের সঠিক উল্লেখ পাওয়া যায় না।

তাঁর কাব্য যে আত্মপরিচয়ের উল্লেখ আছে তার থেকে জানা যায় যে তাঁর পিতার নাম নরসিংহ এবং মাতার নাম রুক্মিনী। পূর্বপুরুষ রাঢ় দেশ ত্যাগ করে বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার বোরগ্রামে বসবাস করতেন। আত্মপরিচয় অংশে আছে—

নারায়ণ দেব কয় জন্ম মগধ
মিশ্র পণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদ ॥
অতি শুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর।
মৌদগোল্য গোত্র মোর গাঁই গুণাকার ॥
পিতামহ উদ্ধব নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর, রুক্মিনী মাতা ॥
পূর্ব-পুরুষ মোর অতি শুদ্ধমতি।
রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোরগ্রামে বসতি ॥

সেযুগে নারায়ণ দেব যে প্রতিভাবান কবি ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর নামের আগে 'সুকবি বল্লভ' উপাধি যুক্ত ছিল। বাংলা দেশ ছাড়া আসামেও তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁকে তাই আসামের কবিও বলা হয়।

নারায়ণ দেবের কাব্যের নাম 'পদ্মা পুরাণ।' কাব্যখানি তিনখণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কবির আত্মপরিচয় ও দেব বন্দনা ইত্যাদি অংশ। দ্বিতীয় খণ্ডে পৌরাণিক কাহিনী সমূহের বর্ণনা এবং তৃতীয় খণ্ডে চাঁদ সওদাগরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দেবখণ্ড অতি সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ। মনসার লৌকিক কাহিনী অপেক্ষা পৌরাণিক কাহিনীর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যের উৎপত্তি

প্রসঙ্গে বলেছেন যে দেবী পদ্মা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে কাব্য রচনা করার আদেশ দেন। সেই আদেশ মত তিনি কাব্য রচনা করেন—

তৎপরে পদ্মা মোরে দেখাইলা স্বপন।
কবিত্বের আশা মোর সেহিত কারণ ॥
... ...
মুনি মুখে শুনিয়াছি সৃষ্টির পত্তন।
পদ্মা পুরাণ কথা শুনে জ্ঞানিজন ॥

করুণ রস সৃষ্টিতে নারায়ণদেব অতুলনীয়। বেহুলার শোক তিনি খুবই হৃদয়স্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেছেন ঃ

প্রভুরে তুমি আমি দুইজন।
জানে তবে সর্বজন ॥
তুমি তো আমার প্রভু, আমি যে তোমার।
মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার ॥

চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে চাঁদ সদাগরের ব্যক্তিত্ব তিনি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। শুধ তাই নয়, চাঁদ সদাগরের চরিত্রের মানবিক দৃঢ়তার ছবিটি তাঁর কাব্যে পরিস্ফুট। তাঁর কাব্যে চাঁদ মনসার ভয়ে পূজা করেন নি। পূজা করেছেন সনকার আত্মহত্যার অঙ্গিকারের জন্য এবং বেহুলার বেদনা-আর্তির জন্য। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চাঁদের চরিত্রের মধ্যে অমানুষিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ দেখা যায়। বাস্তবতার দিক থেকে বিচার করলে এই সব অমানুষিক চিন্তা অশোভন বলে মনে হয় না। লক্ষীন্দরের মৃত্যুর পর চাঁদের নিম্নলিখিত উক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

যদি কানির লাইগ পাম একবার।
কাটিয়া সুজিব আমি মরা পুত্রের ধার ॥
জে কৈরি করিমু কানিরে আমার মনে জাগে।
নাগের উচ্ছিষ্ট পুত্র ভাসাও নিঞা গাঙ্গে ॥

নারায়ণ দেবের কাব্যে হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশী শব্দ ও কোন কোন স্থানে ভাষার গভীরতা তাঁর কাব্যকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। এই দিক থেকে বিচার করলে নারায়ণ দেবকে মঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন বলা চলে। তাঁর কাব্যে বর্ণনাভঙ্গিও উল্লেখযোগ্য। চরিত্র চিত্রণের কথা আগে বলা হয়েছে। এই সব নানা কারণে নারাণদেবের কাব্য সে যুগে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিল। তবে সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং ঘটনার অসংলগ্নতা তাঁর কাব্যের বিশেষ দোষ।

৩. কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠ মনসামঙ্গল কাব্যের কবি। তিনি বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মুখে পড়ে দেশ ত্যাগ করেন। বাল্য শিক্ষাও নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শেষ হয়েছে।

কবি অবশেষে ভাগ্যান্বেষণে রাজা বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা ভারামল্লের অনুগ্রহ লাভ করেন। ভারামল্ল তাঁকে তিনটি গ্রাম দান করেন। কবি সেখানে বসতি স্থাপন করেন। একদা কোন সন্ধ্যায় খড় কাটতে গিয়ে মুচিনী-বেশে দেবী মনসার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মনসা তাঁকে কাব্যরচনা করার নির্দেশ দেন। মনসার আদেশেই তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেন।

কবির আসল নাম ক্ষেমানন্দ। কেতকাদাস তাঁর উপাধি। কেতকা মনসার এক নাম। কবি নিজেকে মনসার দাস হিসেবেই 'কেতকাদাস' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর কাব্যে তিনি বারে বারেই মনসাকে 'কেতকা' বলে উল্লেখ করেছেন।

"বনের ভিতর জন্মাইল মনসাকুমারী।
কিয়া পাতে জন্ম হৈল কেতুকা সুন্দরী॥"

পশ্চিমবঙ্গে আর একজন কেতকাদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন দুই ব্যক্তিই এক জন। কিন্তু অনেক তথ্য প্রমাণ দ্বারা জানা গেছে বর্তমান কেতকাদাস সপ্তদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন।

কেতকাদাসের কাব্যের প্রধান লক্ষণ ভৌগোলিক স্থান সমূহের যথার্থ বর্ণনা এবং সামাজিক রীতিনীতির যথাযথ ব্যবহার। তাঁর কাব্যে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। সহজ ও সরলভাবে তিনি বিষয়-বস্তু উপস্থাপন করেছেন। বেহুলার স্বর্গে যাওয়ার পথের বর্ণনা খুবই বাস্তবানুগ। বেহুলার যাত্রাপথের ২২টি ঘাটের মধ্যে ১৪টি ঘাটের অথবা গ্রামের নামের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা দামোদর, বাঁকা এবং বেহুলা নদীর উভয় তীরে আজও বর্তমান।

চরিত্র-চিত্রণের দিক হতে কেতকাদাসের অবদান উল্লেখযোগ্য। চাঁদ অপেক্ষা বেহুলার চরিত্র খুব সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন। অন্যদিকে মনসার চরিত্রের খল দিকটি উল্লেখযোগ্য ভাবে তুলে ধরেছেন।

তিনি কাব্যের মধ্যে সংস্কৃত রীতিতে অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন। উচ্চাঙ্গের কাব্য পরিচয় তাঁর কাব্যে না পাওয়া গেলেও তাঁর কাব্যের মধ্যে বহুপালার সঙ্কলন চোখে পড়ে। অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের মত তাঁর কাব্যেও পৌরাণিক আখ্যান এবং চাঁদসদাগরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কোথাও কোথাও কাহিনী পরিবেশনের অভিনবত্বও চোখে পড়ে। কেতকাদাসের কাব্যের ভাষা মার্জিত।

আমার বিয়নীখানি লক্ষ টাকা মূল।
চাঁদে ঝলমল যেন কণকের ফুল॥
ব্যজনে বসন্ত আসে পদ্মিনীর বায়।
নিদ্রার কালে লাগে সুশীতল গায়॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে চৈতন্যদেব ও শ্রীচৈতন্য জীবন কথা

ক. সমাজ জীবনে চৈতন্যদেবের প্রভাব

কোন কোন মানুষের আবির্ভাব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় হয়ে থাকে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও মানবতাবাদ সমাজ জীবনে যেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল তেমনি সমকালীন সাহিত্যেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। চৈতন্যদেব এমনি একজন ব্যক্তি যাঁর আবির্ভাবের ফলে বাংলা দেশের ধর্মীয় জীবনে ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। এমনি পরিবর্তন গৌতম বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও সূচিত হয়েছে। তবে ষোড়শ শতকের বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব সার্বিক স্তরে যেভাবে দেখা গেছে এমনটি আর দেখা যায়নি।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলাদেশের ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবনে নানা অনাচার ও দুর্নীতি দেখা দিয়েছিল। এই অনাচার এবং দুর্নীতি সমাজের মর্মমূলে এমন ভাবে গেঁথে ছিল যে সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তুর্কী আক্রমণের পর বাঙালী হিন্দুরা নিজেদের ধর্ম সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য বেদ, স্মৃতি শাস্ত্র ইত্যাদির উপর এমনভাবে ঝুঁকে পড়েছিল যে তার ফল স্বরূপ সমাজের জাতিভেদ প্রথা এবং বর্ণাশ্রম সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে উচ্চবর্ণের মানুষেরা ঘৃণা করতো। সমাজের সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠানে তাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়েছিল। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিভেদ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ধর্মের আড়ম্বর এত বেশি হয়ে উঠেছিল যে সেখানে সাধারণ মানুষের প্রাণের কোন স্পর্শ ছিল না। ধনীরা বিলাসের মধ্যে দিন কাটাতেন। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসবোধ হারিয়ে গেছল। ঠিক এমনি সময়ে আবির্ভাব হয়েছিল চৈতন্যদেবের।

চৈতন্যদেব শুধুমাত্র ভক্ত বা ধর্মীয় প্রবক্তা ছিলেন না। তিনি যে ধর্মের সাধক ছিলেন সে ধর্মের নাম বৈষ্ণব ধর্ম। তিনি এই ধর্মের মূল বক্তব্য মানব প্রেম ও হরিনাম সংকীর্তন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। কারণ এই ধর্ম সাধনার মূল কথা ছিল 'চণ্ডালেঽপি দ্বিজো শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ''। অর্থাৎ চন্ডাল যদি হরিভক্ত হয় তবে তাকেও দ্বিজোত্তম বলা যেতে পারে। চৈতন্যদেব এই হরিনামের দ্বারা সমাজের অবিশ্বাসী-পাষণ্ডী এবং অত্যাচারীদের প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও

মানবতাবাদের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি অখণ্ড মিলনের মেল বন্ধন ঘটিয়ে ছিলেন। ঈশ্বরের নাম সংকীর্তনেরর দ্বারা তিনি সমাজের জাতি ভেদকে অনেকাংশে শিথিল করে ছিলেন এবং মানুষের কাছে মানুষের মহিমার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। চৈতন্যদেব তাঁর জীবনদর্শন দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে মনুষ্যত্বের বিকাশ মানবীয় গুণের প্রকাশের দ্বারাই সম্ভব। শুধু তাই নয়, তাঁর এই চিন্তা-ভাবনা সমকালীন হিন্দু-মুসলমান সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের এই মত ও জীবনাদর্শ এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম সে যুগের সমাজে মানুষের মনে বিশ্বাসের শক্ত ভিত্তিভূমি গঠন করেছিল। এই মানবিক আদর্শবোধ সেযুগের সমাজে প্রতিষ্ঠা করার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ফলে ব্যক্তি চৈতন্যের জীবন এবং জীবন চর্চা, ধর্ম ও উদার মনবতাবাদ সে যুগের সমাজ জীবনের মর্মমূলে দারুণ আলোড়ন তুলেছিল এবং নব জাগরণের সূচনা করেছিল; যাকে অনেকে 'চৈতন্য রেনেসাঁ' বলে অভিহিত করে থাকেন।

খ. সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছিল এবং নানা পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। পূর্বে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে কিছু পদ ও আখ্যান কাব্য রচিত হয়েছিল এবং ভাগবত ও রামায়ণের অনুবাদ হয়েছিল। এই সময় বাংলা সাহিত্য দেবলীলা নির্ভর ছিল। চৈতন্য জীবন প্রভাবে তা মানবিকতার স্পর্শে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তাছাড়া বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদির প্রয়োগ চৈতন্য পরবর্তীকালে অনেক বেশি মার্জিত ও সূক্ষ্ম হয়ে উঠেছিল। পূর্বে সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের প্রধান বাহন ছিল। পাশাপাশি দেশ-ভাষা প্রচলিত ছিল। চৈতন্য সমসাময়িক পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার বিশেষ গুরুত্ব বাংলা ভাষাতে সঞ্চারিত করেছিলেন। তার ফলে চৈতন্য পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের প্রকাশ রীতি সুষ্ঠু ও রুচিসম্মত হয়েছিল।

চৈতন্য দেবের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল বৈষ্ণব পদাবলী ও জীবনী সাহিত্যে। চৈতন্যদেবের জীবন লীলাকে কেন্দ্র করে পদাবলী সাহিত্যে 'গৌর চন্দ্রিকা'র পদ রচিত হয়েছিল। চৈতন্য পরবর্তী পদাবলী সাহিত্যে মধুর ভাব সাধনার দিকটিও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এত দিনে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবের দিকটি দর্শন এবং সাহিত্যের মূলে ছিল; কিন্তু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে মধুরভাবের দিকটি ভক্ত চিত্তে নূতন ভাবরস ও প্রেরণা জাগাল। চৈতন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যের মূল ছিল বৈধীভক্তি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিমান দিকের সাধনা। চৈতন্যদেব যে ভক্তির কথা বললেন তা হচ্ছে 'রাগানুগা ভক্তি' অর্থাৎ প্রেমই ভক্তির মূল উৎস। এই

ভক্তিবাদকে আশ্রয় করে চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের লীলায় চৈতন্যদেবের জীবনলীলার প্রত্যক্ষ ছায়াপাত হলো।

শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বন করে পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-মহাজনেরা 'চরিত কাব্য' বা 'জীবনী সাহিত্যে'র বিপুল সাহিত্য সম্ভার সৃষ্টি করে বাংলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের এই গৌরব সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র চৈতন্যদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে।

চৈতন্য পরিকর রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বল নীলমণি' অথবা 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থগুলি চৈতন্য জীবনদর্শন ভাবিত মধুর রাগাত্মিকা ভাবাদর্শে রচিত হয়েছিল। এই প্রভাব বাংলা সাহিত্যে সুদূর প্রসারী।

চৈতন্য দেবের প্রভাব শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলা সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় তার প্রভাব যথেষ্ট পড়েছিল। পরবর্তী কালের মঙ্গলকাব্যগুলিতে চৈতন্যদেবের আদর্শের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। মুকুন্দরামের কাব্যে চৈতন্যদেব ও তাঁর পরিকরদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল কাব্যেও চৈতন্য জীবনের প্রভাব দেখা যায়। চৈতন্য পূর্ববর্তী মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে কোপন স্বভাবা মনসার যে চিত্র পাওয়া যায় চৈতন্য পরবর্তী মনসামঙ্গল কাব্যে দেবী অনেকখানি কোমল স্বভাবের হয়ে উঠেছেন। চাঁদ সদাগরের চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রেও চৈতন্য পূর্ব এবং চৈতন্য পরবর্তী পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ষোড়শ শতকের অন্যতম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি দ্বিজমাধবের কাব্যে অনেকগুলি 'বিষ্ণুপদ' পাওয়া গেছে। এটি চৈতন্য জীবনের বিশেষ প্রভাব।

চৈতন্য পরবর্তী অনুবাদ সাহিত্যে চৈতন্য জীবনের প্রভাব বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। বিশেষ করে চৈতন্য পরবর্তী ভাগবতের অনুবাদে এই প্রভাব চোখে পড়ে। চৈতন্য পূর্বযুগে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য লীলাই ভাগবতের বিষয়বস্তু ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে চৈতন্য প্রবর্তিত রাগানুগা ভক্তি ধারা অনুসারে রাধাকৃষ্ণের ভাগবত বহির্ভূত লীলার বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

রামায়ণের অনুবাদের ক্ষেত্রেও রাম চরিত্র চিত্রণের দিকটি লক্ষণীয়। মূল সংস্কৃত রামায়ণে রামচন্দ্রের বীর সত্বা চৈতন্য পরবর্তী কবিদের হাতে অনেক কোমল রূপে চিত্রিত হয়েছে।

চৈতন্যদেবের প্রভাব শুধুমাত্র মধ্যযুগের সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে বললে ভুল হবে। পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের শাক্ত পদাবলী, কীর্তন গানে এমনকি বাউল গানে চৈতন্য জীবনের প্রভাব চোখে পড়ে।

সর্বোপরি চৈতন্যদেব বাংলা দেশে যে ভক্তি রসের ধারা প্রবর্তন করেছিলেন তার ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আজও প্রবাহমান। তাই তো কবির কবিতার ধ্বনিত হয়ে উঠেছে ঃ

'বাউল আর কীর্তনের গানে আমরা দিয়াছি খুলি।
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি॥'

চৈতন্য কেবলমাত্র আটটি শ্লোক ছাড়া আর কিছুই রচনা করেন নি। তবুও কবি অথবা সাহিত্যিক না হয়েও তিনি তাঁর জীবন দর্শনের ও জীবন কথার সোনার কাঠির সংস্পর্শে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গণ ভরে দিয়েছেন।

গ. শ্রী চৈতন্য জীবন কথা

বাংলা দেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বাংলা ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নবদ্বীপে চৈতন্য দেবের জন্ম হয়। তিনি যে সময় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন তখন নবদ্বীপ ছিল সর্বভারতীয় বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র। সংস্কৃত এবং স্মৃতি, ন্যায়-দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যয়ন করার জন্য ভারতের নানা প্রান্ত হতে বিদ্যার্থীরা এখানে এসে উপস্থিত হতেন। শ্রীচৈতন্য দেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন শ্রীহট্টের বাসিন্দা। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা উড়িষ্যার যাজপুর হতে শ্রীহট্টে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে পড়াশুনা করার জন্য এসেছিলেন এবং পরবর্তী কালে তিনি আর শ্রীহট্টে ফিরে যান নি। নবদ্বীপের নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করে নবদ্বীপেই স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি নিজে ছিলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ। পরপর সাতটি কন্যা মৃত্যুর পর তাঁদের দু'টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। বড় পুত্র বিশ্বরূপ লেখাপড়া শিখে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বম্ভর পাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই ভয়ে পিতামাতা তাঁকে পাঠশালা ছাড়িয়ে দেন।

বিশ্বম্ভরের ডাক নাম ছিল নিমাই। নিমাই-এর গায়ের রঙ গৌরবর্ণ ছিল বলে অনেকে তাকে গৌরাঙ্গ অথবা গোরা বলে ডাকত। সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিমাইয়ের নাম হয় চৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

লেখাপড়া বন্ধ করে দেওয়ার জন্য নিমাইয়ের দৌরাত্ম ও দস্যুপনা খুব বেড়ে যায়। নিমাইয়ের বাবা আবার তাঁকে লেখাপড়া শেখার জন্য পাঠশালায় পাঠান। অল্প-কালের মধ্যে নিমাই নানা শাস্ত্র অধ্যয়ণ করে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এই সময় তিনি নবদ্বীপে টোল খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। নিমাই কিছুদিন পূর্ববঙ্গে বেড়াতে যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে লক্ষ্মীপ্রিয়া সর্পদংশনে মারা যান। এই দুর্ঘটনা নিমাইকে সংসার প্রতি বিরাগ করে তোলে। ইতিমধ্যে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। সব মিলে নিমাই ধীরে ধীরে উদাসীন হয়ে ওঠেন। তাঁর মাতা পুত্রের আচার আচরণে চিন্তিত হয়ে আবার বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন।

কিন্তু নিমাইয়ের জীবনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। নিমাই পিতার শ্রাদ্ধ দেওয়ার জন্য গয়া গমন করেন। সেখানে তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর প্রধান শিষ্য তত্ত্বজ্ঞানী ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পরই তাঁর মনের মধ্যে দিব্যভাব দেখা দেয়। সঙ্গী সাথীরা কোন প্রকারে তাঁকে নবদ্বীপে

ফিরিয়ে আনেন। ততক্ষণে নিমাইয়ের আন্তর্জীবনে বিপ্লবে ঘটে গেছে। নবদ্বীপের টোল এবং অধ্যাপনা বন্ধ করে দিয়ে তিনি হরিনাম সংকীর্তনে আত্মনিয়োগ করলেন। পর পর তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন অবধূত নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য এবং মুসলমান কুলোদ্ভব হরিদাস। নিমাই কখনো স্বগৃহে অথবা অন্যত্র হরিনাম সংকীর্তন ও কৃষ্ণকথা আলোচনা করে সারা নবদ্বীপবাসীর মনের মধ্যে এক তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করলেন।

নিমাইয়ের আরও কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। তিনি জাতি বিচার মানতে চাইলেন না। নিম্নবর্ণের মানুষ এমন কি মুসলমানদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা আরম্ভ করলেন। এবং সকলকে নিয়ে তিনি হরিনাম সংকীর্তন করে বিভোর হয়ে থাকতেন। এইভাবে সারা নবদ্বীপে ভক্তি রসের স্রোতধারা বইয়ে দিলেন। হিন্দু ব্রাহ্মণদের রক্ষণশীল গোষ্ঠী নিমাই এর উপর এই সব ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা নিমাই এর দলের পেছনে লাগলেন। জগাই মাধাই নামে দুই মদ্যপ গুন্ডাকে দিয়ে নিমাই-এর দলের লোকদের উপর হামলা চাললেন। নিত্যানন্দ ও ভক্ত হরিদাসকে আক্রমণ করলেন। নিমাই ও তাঁর সম্প্রদায় তাদের ক্ষমা করলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই ক্ষমাধর্ম দেখে জগাই-মাধাইএর চরিত্রের পরিবর্তন হলো তারা নিমাইয়ের বশীভূত হয়ে পড়লো। তখন রক্ষণশীল দলের লোকেরা নিমাই এবং তার দল বলের বিরুদ্ধে কাজীর কাছে নালিশ জানালো। কাজী একদিন তার দলের লোকজন দিয়ে সংকীর্তনের মিছিল ছত্রভঙ্গ করে দিলেন, লোকজন দিয়ে মারধর করলেন এবং খোল ভেঙে দিলেন।

নিমাই এতে টললেন না। তিনি একদিন তাঁর সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকজন নিয়ে বিরাট এক কীর্তনের মিছিল সারা নবদ্বীপ পরিক্রমা করে কাজীর কাছে এলেন। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হলো। নিমাই তাঁর শাস্ত্রবহির্ভূত ধর্মমতও ভাবাদর্শের কথা কাজীকে বোঝালেন। কাজী তাঁর যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে সংকীর্তন ও ভক্তিধর্মের বিরোধিতা বন্ধ করলেন।

নিমাই স্থির করলেন এবারে তিনি সন্ন্যাস নেবেন। শচীদেবী এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানালেন। মাতা ও পত্নীর অশ্রুজল তাঁকে টলাতে পারলো না। তিনি গৃহত্যাগ করে কাটোয়ার আচার্য কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ বৎসর পূর্ণ হয় নি। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর নাম হলো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। তখন হতেই তিনি চৈতন্য নামে পরিচিত হলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যের বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ হতে থাকলো। তিনি কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বৃন্দাবন যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে কাটোয়া ত্যাগ করলেন। কিন্তু তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান ছিল না। তাই নিত্যানন্দ তাঁকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত-আচার্যের বাড়ি নিয়ে এলেন। সেখানে শচীদেবী পুত্রের সঙ্গে মিলিত হলেন। কিছুদিন থাকার পর শ্রীচৈতন্য আর থাকতে চাইলেন

না। মায়ের ইচ্ছায় বৃন্দাবনের পরিবর্তে নীলাচলে (পুরীতে) যাওয়া স্থির হলো। নিত্যানন্দ, দামোদর এবং মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন অনুগত ভক্ত সহ গঙ্গাতীরের পথ ধরে তিনি নীলাচল যাত্রা করলেন। ছত্রভোগে গঙ্গা পার হয়ে ওড়িশায় প্রবেশ করলেন।

চৈতন্যদেব পুরীর মন্দির দূর থেকে দেখে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে মন্দির প্রাঙ্গণে আছাড় খেয়ে এবং অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সে সময়ে মন্দিরে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের প্রধান পন্ডিত বৈদান্তিক সার্বভৌম উপস্থিত ছিলেন। তিনি মন্দির পরিচারকদের সাহায্যে এই নবীন সন্ন্যাসীকে নিজ গৃহে নিয়ে যান এবং পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে এসে ন্যায়-বেদান্তের দম্ভ ছেড়ে ভক্তিপন্থী বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন।

চৈতন্যদেব মাত্র দু'মাস নীলাচলে কাটিয়ে দক্ষিণ ভারতের তীর্থ সমূহ পর্যটনে বের হলেন। কুর্মস্থান এবং নৃসিংহ ক্ষেত্র দর্শন করে গোদাবরী পার হয়ে রাজমন্দ্রীতে যান। সেখানে রামানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দশদিন অবস্থানের পর তিনি রাজমন্দ্রী ত্যাগ করে রামানন্দের নিকট হতে বিদায় নিয়ে শ্রীরঙ্গমে আসেন। এখানে ভেঙ্কট ভট্ট তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখান হতে সেতু বন্ধ রামেশ্বর যাওয়ার পথে ঋষভ পর্বতে মাধবেন্দ্রপুরীর প্রধান শিষ্য পরমানন্দপুরীর সঙ্গে মিলিত হন। সেতুবন্ধ রামেশ্বর হয়ে কেরল এবং সেখান হতে মহারাষ্ট্র হয়ে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ দেহরক্ষা করেছেন।

রামানন্দ চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যলাভের ইচ্ছায় চাকুরী ছেড়ে নীলাচলে স্বগৃহে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। চৈতন্যের ভক্তি ধর্ম এবং প্রেম ধর্মের আকর্ষণে রাজা প্রতাপ রুদ্র এবং তাঁর গুরু কাশী মিশ্র চৈতন্য অনুরাগী হয়ে উঠলেন। চৈতন্যদেব তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাশী মিশ্রের উদ্যান বাটিতে অবস্থান করেছেন। অল্পদিনের মধ্যে পরমানন্দপুরীও এসে নীলাচলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সেরে পুরী ফিরে আসার পর বাঙালী ভক্তগণ পুরী এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁরা সকলে মিলে প্রতি সন্ধ্যায় জগন্নাথ মন্দিরে সংকীর্তন আরম্ভ করলেন। এই ভক্তরা রথযাত্রা পর্যন্ত পুরীতে কাটিয়ে আবার দেশে ফিরে আসতেন। শুধু বাঙালী ভক্ত নয়—সর্বভারতীয় ভক্ত সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য নানা সময়ে তাঁরা নীলাচলে আসতেন। এইসব ভক্তবৃন্দের সমূহ ব্যয়ভার বহন করতেন উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দেবের মন্দির হতেই। বাংলাদেশের সবভক্ত ফিরে গেলেও চৈতন্যদেবকে ছেড়ে গেলেন না ভক্ত হরিদাস। তিনি তার সঙ্গেই থেকে গেলেন।

পুরী কিছুদিন থেকে তিনি ১৫১৪ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় যাত্রা করেন। শান্তিপুরে মাতা শচীদেবীর সঙ্গে শেষবারের মত সাক্ষাৎ হয়। গৌড়ীয় ভক্তগণ তাঁকে সাদরে

হুসেন সিংহাসনে স্থান দেন। তখন গৌড়ের সিংহাসনে হুসেন শাহ রাজত্ব করতেন। তিনিও চৈতন্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হুসেন শাহের দুই মন্ত্রী সাকর মল্লিক ও দাবিরখান চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁরা দুই ভাই ছিলেন। চৈতন্যদেব এঁদের নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে সনাতন ও রূপ নামে অভিহিত করেন। এঁরা রাজকার্য পরিত্যাগ করে চৈতন্যদেবের নির্দেশে বৃন্দাবনে বৈষ্ণব কাব্য ও অলঙ্কার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

গৌড় থেকে প্রত্যাবর্তন করে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন বলভদ্র ভট্টদেব ও ব্রাহ্মণ পরিচারক। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পর মোট ছ'বছর কাল তীর্থ ভ্রমণে ভারতের নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তারপর তিনি আর আঠারো বছর কাল বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এই আঠারো বছর নীলাচল ছেড়ে আর কোথাও যাননি। জীবনের শেষ কয়েক বছর কখনো বাহ্যজ্ঞান লোপ অবস্থায়, আবার কখনো ভক্ত জনের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলোচনায় অথবা হরিনাম সংকীর্তন করে কাটিয়েছেন। তিনি সব সময় কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হয়ে থাকতেন। কখনো কখনো জয়দেব-চণ্ডীদাসের পদাবলী অন্যের সঙ্গে গাইতেন। ভাবোন্মাদে অন্যকে কৃষ্ণবোধে আলিঙ্গন করতেন। রথের সময় ভক্তবৃন্দকে নিয়ে রথের আগে ভাবঘোরে নৃত্য করতেন।

চৈতন্যদেবের চরিত্রে কোমল ও কঠোরতার মিশ্রণ ছিল। অন্যায়কে তিনি কঠোর ভাবে বর্জন করতেন ভক্তদের ক্ষেত্রে তিনি কোমল মধুর স্বভাবের ছিলেন। কেউ তাঁকে ঈশ্বরের অবতার বললে তিনি ক্রুদ্ধ হতেন। রামানন্দ তাঁকে একবার ঈশ্বর বলায় তিনি বলেছিলেন, "প্রভু নহে আমি মানুষ আশ্রমে সন্ন্যাসী।"

শেষ কয়েক বছর তিনি দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটান। অবশেষে ১৫৩০ খ্রীঃ মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে তিনি মানবলীলা সাঙ্গ করেন।

চৈতন্যদেব কোন ধর্ম প্রচারক ছিলেন না। ধর্মের গুরুভার তত্ত্ব ভক্তদের উপর চাপিয়ে দিতেন না। তিনি তাঁর জীবন দর্শন ও প্রেমধর্ম এবং ভক্তি চিন্তা দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকর্ষণ করেছেন। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তাঁর প্রেম ধর্মের ছত্র ছায়ার আশ্রয় লাভ করেছে।

জীবিত অবস্থায় তাঁর ভক্তরা তাঁকে অবতার হিসেবেই দেখতেন। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের ভাব দর্শন করে সে যুগের অনেক প্রত্যক্ষদর্শী পদাবলী রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর জীবন অবলম্বন করে চরিত কাব্য রচনা হয়েছে। চৈতন্যদেব নিজে কোন গ্রন্থ লেখেননি। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে কৃষ্ণভক্তি এবং নিজের ভক্তিভাব প্রকাশ করার জন্য মাত্র আটটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেছেন। বৈষ্ণবগণ এগুলিকে 'শিক্ষাষ্টক' বলে থাকেন। তাঁর জীবন এবং জীবনদর্শনই লোক শিক্ষার বাহন ছিল।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব তাই ইতিহাসের এক ক্রান্তি নির্দেশক অধ্যায়। বাঙালী জাতির জীবনে এমন অধ্যায় আজও পর্যন্ত উপস্থিত হয়নি।

চণ্ডীমঙ্গল

সপ্তম অধ্যায়	চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবি সহ কাব্যালোচনা

ক. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দেবী চণ্ডীর মহিমা বিষয়ক কাব্যই চণ্ডীমঙ্গল নামে খ্যাত। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে দেবী চণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। সে জন্যে 'চণ্ডী'কে অন-আর্য দেবী বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক দেব-কল্পনায় পৌরাণিক পার্বতীর সঙ্গে দেবী চণ্ডী মিশে গেছে। এই জন্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক উভয় প্রকার চিন্তাভাবনার মিশ্রণ দেখা যায়। অবশ্য দ্বাদশ শতকের পরবর্তী কালে রচিত পুরাণ গুলিতে দেবী চণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে তুর্কী আক্রমণের পর সমাজের অভিজাত ও সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে সংস্কৃতি বিনিময়ের ফলে অন-আর্য দেব দেবী পৌরাণিক দেব দেবীর মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। চণ্ডীর ক্ষেত্রেও এই একই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখ্যান দীর্ঘ। এবং এই কাব্যের দুটি আখ্যান প্রচলিত। এক. আখেটিক খণ্ড অথবা কালকেতু ফুল্লরার উপাখ্যান; দুই. বণিক খণ্ড অর্থাৎ ধনপতি ও শ্রীমন্ত উপাখ্যান। মনসা মঙ্গলের মত একাব্যের কাহিনীও প্রাচীনতার ধারা বহণ করে। মনসামঙ্গল কাব্য পূবঙ্গের জাতীয় জীবনের ভাব সমৃদ্ধ কাব্য; অনুরূপভাবে চণ্ডীমঙ্গল পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় ভাব সমৃদ্ধ কাব্য হিসেবে বিবেচিত। কারণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পুষ্টি এবং ব্যাপকতা পশ্চিমবঙ্গ ঘিরেই। যাই হোক কাহিনীর ধারা অনুসরণ করে বোঝা যায় কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনীটিই প্রাচীন এবং ধনপতি শ্রীমন্তের কাহিনী পরবর্তীকালের। এই দুটি কাহিনীর সংযুক্ত রূপই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'নর খণ্ডের' বর্ণনা।

১. কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী (আখেটিক-কাহিনী)

দরিদ্র শিব-গৃহিণী পার্বতী সখী পদ্মার উপদেশে মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য সচেষ্ট হলেন। মর্ত্যে পূজা প্রচার হলে পার্বতীর দুঃখ মোচন হবে। ইন্দ্রের

পুত্র নীলাম্বরকে দিয়ে দুর্গা এই পূজা প্রচারের মনস্থ করলেন। শিব ছল করে নীলাম্বরকে শাপ দিলেন মর্তে ব্যাধের ঘরে জন্মাবার জন্য। নীলাম্বরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ছায়াও স্বামীর অনুগামিনী হলেন। ফলে, নীলাম্বর কালকেতু নামে ধর্মকেতু ব্যাধের পুত্ররূপে এবং ছায়া সঞ্জয়কেতু ব্যাধের কণ্যারূপে ফুল্লরা নামে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করলেন।

কালকেতু বাল্যকালেই ব্যাধদের মধ্যে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং রূপে গুণে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অন্যদিকে ফুল্লরাও ব্যাধকন্যা হলে কি হবে—তিনিও পরম রূপবতী এবং ঘরকন্নার কাজে খুব নিপুণা হয়ে উঠলেন। যথা সময়ে কালকেতু ও ফুল্লরার একদিন বিয়ে হয়ে গেল। পিতামাতা কালকেতুর হাতে বার্ধক্য হেতু সমস্ত সংসারের ভার তুলে দিল। কালকেতু বনের পশুপাখি শিকার করে আনে আর ফুল্লরা সেই মাংস হাটে বিক্রি করে। এইভাবে সুখের সংসার মোটামুটি ভালভাবেই চলে যাচ্ছিল।

দেবীচণ্ডী ছিলেন অরণ্যের পশু-পাখির রক্ষায়িত্রী। কালকেতুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে পশু-পাখিরা একদিন এসে দেবী চণ্ডীর নিকট নালিশ জানালো। দেবী এই ব্যাধ দম্পতিকে করুণা করতে চাইলেন। তিনি একদিন মায়াবলে অরণ্যের সব পশু-পাখিকে সরিয়ে দিলেন। ব্যাধ কালকেতু সারা অরণ্যঘুরে কিছুই পেল না। অবশেষে এক স্বর্ণ-গোধিকা পেয়ে তাকেই বেঁধে আনলো আহারের জন্য। আসলে দেবী চণ্ডী স্বর্ণগোধিকা রূপে কালকেতুর দৃষ্টি পথে পড়ে ছিলেন। কালকেতু বাড়ি এসে ফুল্লরাকে স্বর্ণ-গোধিকাটি পোড়াতে বলে গত দিনের বাসি মাংস নিয়ে বাজারে গেল। ফুল্লরা স্বামীর আহারের পরিমান জানত। এই সামান্য গোধিকায় স্বামীর ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে না ভেবে সে গেল প্রতিবেশীর বাড়িতে ক্ষুদ ভিক্ষা করতে।

এই সময়ের মধ্যে দেবী চণ্ডী গোধিকার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করে একজন সুন্দরী যুবতীর বেশ ধারণ করে কালকেতুর কুঁড়েঘরের দাওরায় বসে থাকলেন। ফুল্লরা ফিরে এসে দেবীকে দেখে খুব হকচাকিয়ে গেল। সে দেবীর পরিচয় জানতে চাইল। দেবী তাকে জানাল সতীনের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছে। বনে বনে মনের দুঃখে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময় পথে কালকেতুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় ব্যাধ তাকে সঙ্গে করে এনেছে। ফুল্লরা স্বামীর ব্যবহারে দুঃখ পেল। দরিদ্রের সংসার হলেও দাম্পত্য জীবন তার ভালভাবে কাটছিল। সুন্দরী রমণীর মোহে পড়ে তার স্বামী তাকে ঘরে তুলেছে। ফুল্লরা দেবীকে বোঝালো। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। তখন ফুল্লরা তার বারমাসের সুখ দুঃখের কাহিনী 'বারমাস্যা' বর্ণনা করলেন। কিন্তু এতেও দেবীর চলে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তখন ফুল্লরা বেরোলো ব্যাধের খোঁজে। পথে দেখা হতে সে সব কিছু জানালো স্বামীকে।

কালকেতু বাড়ি ফিরে দেখল সত্য সত্যই এক পরম রূপবতী মহিলা তার ঘরের দাওয়ায় বসে আছেন। কালকেতু তাঁকে দেখে সবিনয়ে নিবেদন করলো ঃ

বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার।
যে বা সে বা হও গো আমার নমস্কার॥
ছাড় এই স্থান মাতা ছাড় এই স্থান।
আপনে সে রক্ষা কর আপনার মান॥

অনুরোধে যখন দেবী স্থান ত্যাগ করলেন না তখন কালকেতু শরনিক্ষেপে উদ্যত হল। কিন্তু, দেবীর মায়ায় শর হাতে লেগে থাকল। দেবী তখন নিজের পরিচয় দিলেন এবং কালকেতুকে একটি মহামূল্য আংটি ও সাতঘড়া ধন উপহার দিয়ে বললেন—এই ধনের সাহায্যে গুজরাটে রাজ্য ও রাজধানী স্থাপন করতে এবং নিয়মিত চন্ডী পূজা করে চন্ডীর মাহাত্ম্য প্রচার করতে। এই বলে দেবী অন্তর্হিতা হলেন।

কালকেতু আংটি বিক্রয় করার জন্য গেল মুরারী শীলের কাছে। মুরারী শীল ছিল খুব ধূর্ত। সে কালকেতুকে ঠকাতে চাইল; কিন্তু দেবী চন্ডীর আদেশে কালকেতুকে সঠিক মূল্য দিল। কালকেতু দেবী প্রদত্ত ধন পেয়ে বন কেটে নগর পত্তন করলো। দেবীর চেষ্টায় গুজরাট নগরে নানা স্থান থেকে লোক এসে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করলো। এদের মধ্যে ভাঁড়ু দত্ত নামে এক ধূর্ত প্রকৃতির লোক ছিল। সে কালকেতুর রাজত্বে নিজেই মোড়ল হয়ে হাটুরেদের কাছ থেকে তাদের ক্ষমতার বাইরে 'তোলা' আদায় করতে লাগল এবং একদিন হাটুরেদের মারধর করল। কালকেতু জানতে পেরে তাকে অপমান করে গুজরাট রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিল। ভাঁড়ুদত্ত এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পার্শ্ববর্তী কলিঙ্গরাজকে গিয়ে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। মিথ্যে করে জানাল—কালকেতু যে কোন সময় কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করতে পারে। চরমুখে কলিঙ্গরাজ কালকেতুর রাজ্যের সমৃদ্ধির সংবাদ পেয়ে সব অবগত হলেন এবং একদিন গুজরাট রাজ্য আক্রমণ করলেন। কিন্তু কলিঙ্গ রাজের পরাজয় ঘটল।

ভাড়ুদত্ত এতেও দমলো না। সে আবার নূতন করে কলিঙ্গরাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। বলল, কলিঙ্গ রাজের সেনাপতি কালকেতুর কাছে ঘুষ খেয়েছে। এছাড়া গুজরাটের অনেক গোপন পথেরও নিশানা দিল। কলিঙ্গরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে আবার গুজরাট আক্রমণ করল এবং এবারে কালকেতু পরাজিত ও বন্দী হলো। ফুল্লরা স্বামীকে উদ্ধার করার অনেক চেষ্টা করলো। অবশেষে দেবী চন্ডী স্বপ্নে কলিঙ্গরাজকে ভয় দেখিয়ে আদেশ দিলেন কালকেতুকে ছেড়ে দিতে। কলিঙ্গরাজ কালকেতুকে সসম্মানে মুক্তি দিলেন। গুজরাটে এবং কলিঙ্গে দেবীর চন্ডীর পূজা প্রতিষ্ঠা হলো।

কালকেতু পুত্র পুষ্পকেতুর উপর রাজ্যের ভার দিয়ে স্বর্গে চলে গেল এবং তাদের অভিশাপ পর্ব শেষ হলো।

২. ধনপতি—শ্রীমন্ত কাহিনী (বণিক খণ্ড)

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনীটি ধনপতি—শ্রীমন্ত কাহিনী। দেবী চণ্ডী কালকেতু উপাখ্যানে সাধারণ মানুষ এবং রাজাদের পূজা পেয়েছেন। ধনপতি শ্রীমন্ত কাহিনীতে তিনি সমাজের অভিজাত শ্রেণী বণিক সমাজের নিকট হতে পূজা আদায়ে তৎপর হয়েছেন। বলা বাহুল্য 'বণিক খণ্ড' মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগরের অনুকরণে গঠিত। যাইহোক ধনপতি-শ্রীমন্ত কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

ইন্দ্রের সভায় নর্তকী ছিল রত্নমালা। দেবসভায় নৃত্যের সময় তালভঙ্গ করার জন্য তাকে শাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠানো হলো। রত্নমালা মর্তের বণিক গৃহে জন্মালো ; তার নাম হলো খুল্লনা। এর মধ্যে ইন্দ্রপুত্র মণিকর্ণ এবং তাঁর স্ত্রী চন্দ্ররেখা অভিশাপগ্রস্ত হয়ে ধনপতি ও লহনা নামে স্বামী-স্ত্রী রূপে মর্ত্যে বসবাস করতে লাগল। ধনপতি ছিলেন সমাজের অভিজাত বণিক। তিনি ছিলেন শিবের উপাসক। দেবী চণ্ডী খুল্লনাকে দিয়ে তাঁর পূজা প্রচারের জন্য সচেষ্ট হলেন।

একদিন ধনপতি পায়রা উড়াতে গিয়ে একটি পায়রা হারিয়ে ফেললেন। সেই পায়রার খোঁজ পেলেন লক্ষপতির মেয়ে খুল্লনার কাছে। ধনপতি খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইলেন। এদিকে আবার খুল্লনা ছিল ধনপতির প্রথমা পত্নী লহনার খুড়তুতো বোন। এ বিয়েতে লহনা খুব আপত্তি জানালো। ধনপতি তাকে অনেক বোঝালেন ; কিন্তু কিছুতেই স্ত্রীর মন গলাতে পারলেন না। অবশেষে অনেক গহনাপত্র দেবেন বলে আশ্বাস দিয়ে লহনাকে রাজী করালেন এবং খুল্লনাকে বিয়ে করে বাড়ি আনলেন।

প্রথমের দিকে লহনা তার বোন ও সতীনকে ভাল চোখে দেখত। কিন্তু শেষে দাসী দুর্বলার চক্রান্তে বিষ চোখে দেখতে লাগল। এই সময় রাজা ধনপতিকে গৌড় থেকে সোনার খাঁচা তৈরী করে আনার হুকুম করলেন। ধনপতি গৌড় যাত্রা করলে লহনা সতীন কাঁটা দূর করার জন্য দুর্বলার পরামর্শে ও সই লীলাবতীর চক্রান্তে খুল্লনাকে ধনপতির জাল চিঠি দেখালো। চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী লহনা খুল্লনাকে ভাল খেতে দিত না এবং প্রত্যহ-ছেঁড়া কাপড় পরিয়ে ছাগল চরাতে পাঠাতো। অনাহারে এবং কষ্ট পরিশ্রমে খুল্লনার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য নষ্ট হলো। দেবী চণ্ডী একদিন লহনার সর্বশী নামে একটি ছাগলকে লুকিয়ে রাখলেন। খুল্লনা কাঁদতে কাঁদতে বনে বনে ছাগল খুঁজে বেড়াতে লাগলো। হঠাৎ ছাগল খুঁজতে খুঁজতে খুল্লনা দেবীর মায়ায় সৃষ্ট পঞ্চ কন্যাকে চণ্ডীপূজা করতে দেখলো। খুল্লনা তাদের কাছ থেকে চণ্ডীপূজার রীতিনীতি শিখে নিল। এবং জেনে নিল চণ্ডীপূজা করলে সংসারের সমূহ অমঙ্গল দূর হয়। খুল্লনা পূজার রীতিনীতি শিখে নিয়ে এক মঙ্গলবার চণ্ডীরপূজা করলো এবং সেদিনই সর্বশীকে খুঁজে পেল। দেবী চণ্ডী সন্তুষ্ট হয়ে তাকে পুত্রবতী ও পতি সোহাগিনী হবার বর দান করলেন।

ধনপতি গৌড় থেকে ফিরে সব শুনে লহনাকে তিরস্কার করলেন। খুল্লনার প্রতি তাঁর অনুরাগ পূর্বাপেক্ষা বেড়ে গেল। লহনা এই ঘটনার পর আর সতীনের উপর বৈরী ভাব দেখাত না। কিন্তু খুল্লনা অনেকদিন বনে ছাগল চরিয়েছে বলে ধনপতির পিতার শ্রাদ্ধ সভায় অন্যান্য বণিকেরা তার সতীত্বের পরীক্ষা চাইল। খুল্লনা সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলো।

এই সময় রাজা ধনপতিকে সিংহলে বাণিজ্য যাত্রার জন্য আদেশ করলেন। খুল্লনা স্বামীর কল্যাণ কামনায় চণ্ডী ঘট স্থাপন করলেন। শিবভক্ত ধনপতি চন্ডীর ঘট লাথি মেরে ভেঙে দিলেন। দেবী চণ্ডী ধনপতির উপর ক্ষুব্ধ হলেন এবং উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন।

সিংহল যাওয়ার পথে কালীদহে ধনপতি চণ্ডীর মায়ায় পদ্মবনে এক সুন্দরী রমণীকে পদ্মের উপর বসে একটি হাতী গিলতে এবং উগরে দিতে দেখলেন। সিংহলে গিয়ে সেখানের রাজা শালবাহনকে পথে দেখা দৃশ্যের বর্ণনা করেন। কিন্তু ধনপতি শালবাহনকে ঐ দৃশ্য পুনরায় আর কালীদহে দেখাতে পারলেন না। মিথ্যা কথা বলে প্রতারণার জন্য ধনপতির দীর্ঘ বার বছর কারাবরণ করতে হলো।

ইতিমধ্যে খুল্লনার গর্ভে ধনপতির এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলো। পুত্রের নাম শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা করলেন। শ্রীমন্ত পথে পিতার মত কালীদহে 'কমলে কামিনী' দর্শন করলেন। সিংহল রাজ শালবাহনকে শ্রীমন্ত তার এই অদ্ভুত 'কমলে কামিনী' দর্শনের কথা বললেন। সিংহলরাজ নিজে সে দৃশ্য দেখতে চাইলেন। স্থির হল যদি শ্রীমন্ত তাঁকে কমলে কামিনী দেখাতে পারেন তবে পিতার মুক্তি ও অর্ধেক রাজত্ব পাবেন; না হলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীমন্তও রাজাকে কমলে কামিনী দেখাতে অসমর্থ হলো। ফলে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো। শ্মশানে শ্রীমন্ত দেবী চণ্ডীর স্তব করতে লাগলেন। দেবী শ্মশানে উপস্থিত হয়ে রাজার সৈন্য-সামন্তদের তাঁর ভূতপ্রেত অনুচরদের দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। এবারে চণ্ডীর ইচ্ছায় শ্রীমন্ত রাজাকে 'কমলে কামিনী' দেখাতে পারলেন। রাজা পূর্বসর্ত অনুযায়ী ধনপতিকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করলেন। তখন চণ্ডী রাজাকে এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখালেন। রাজা ভয়ে ধনপতির মুক্তি দিলেন। পিতাপুত্রের মিলন হলো। শ্রীমন্তের সঙ্গে রাজকন্যা সুশীলার বিয়ে দিলেন সিংহলরাজ শালবাহণ। নৌকা, বাণিজ্যসম্ভার, পুত্র এবং পুত্রবধূ নিয়ে দেশে ফিরলেন ধনপতি। উজানি নগরে ফিরে সেখানে রাজাকে 'কমলে কামিনী' দেখিয়ে শ্রীমন্ত রাজকন্যা জয়াবতীকে বিয়ে করলেন। দেশে ফিরে ধনপতি সাড়ম্বরে চণ্ডীর পূজা করলেন।

তাঁদের অভিশাপের মেয়াদ শেষ হলো। তাঁরা সকলে স্বর্গে চলে গেলেন।

খ. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুই প্রধান কবি

১. দ্বিজ মাধব

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি দ্বিজ মাধব। অবশ্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পথিকৃত কবি মাণিক দত্ত। মাণিক দত্তের পরে দ্বিজ মাধবই এই কাব্যের পরবর্তী প্রতিষ্ঠিত কবি।

দ্বিজ মাধবের কাব্যে তাঁর আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিজ মাধবের এই আত্মপরিচয় অংশ আমাদের নানাভাবে বিভ্রান্ত করে। তাঁর কাব্যে লিপিবদ্ধ আত্ম-পরিচয়ের অংশটি নিম্নরূপ ঃ

পঞ্চ গৌড় নামে এক গ্রামের প্রধান।
একাত্মর অধিকারী অর্জুন সমান ॥
প্রতাপে তপন সমজ্ঞানে বৃহস্পতি।
কলিযুগে তার তুল্য রাজা নাহি ক্ষিতি ॥
সেই পঞ্চ গৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ধারায় ত্রিবেণী গঙ্গা বহে নিরন্তর ॥
সপ্তদ্বীপ মাঝারে নদীয়া এক স্থান।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রি বৈশ্য শূদ্র অনেক প্রধান ॥
পরাশর সুত হয় মাধব তার নাম।
কলিযুগে ব্যাসতুল্য গুণে অনুপম ॥

উপরের আত্মপরিচয় হতে জানা যায় কবি পঞ্চগৌড়ের অন্তর্ভুক্ত সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তখন পঞ্চগৌড় আকবর বাদশাহের অধীনে ছিল। কবির পিতার নাম ছিল পরাশর। কবি নিজেকে ‘কলিযুগে ব্যাসতুল্য’ বলে অভিহিত করেছেন। আত্মপয়িচয়ের বর্ণনা অনুযায়ী কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কবির একটিও কাব্য পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় নি। তাঁর কাব্যের সমস্ত পুঁথিই চট্টগ্রাম হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ জন্যে অনেকে তাঁকে চট্টগ্রামের কবি বলে মনে করেন।

দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম ‘সারদা-চরিত’ অথবা ‘সারদা মঙ্গল’। তাঁর কাব্যের মধ্যে স্থানে স্থানে এই দুটি নামের উল্লেখ আছে। ‘শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল’ রচয়িতা আর একজন দ্বিজ মাধবের উল্লেখ পাওয়া যায়। আত্মপরিচয় অংশ উভয় কবির প্রায় একই। সে জন্যে অনেকে এই দুই কাব্যের কবিকে একই ব্যক্তি বলে মনে করেন। এই সঙ্গে আরও অনুমান করেন যে কবি পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন, পরে কোনরূপ রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তিনি পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে বসবাস স্থাপন করেন এবং সেখানেই চণ্ডীমঙ্গল এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। একই কবি শাক্ত এবং বৈষ্ণব ভাবাপন্ন এ বিষয় নিয়ে অনেকের মতভেদ আছে। কেউ

দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চন্ডীর আদেশ পাই শিলাই বহিয়া যাই
আড়রায় হইলুঁ উপনীত ॥

কবি স্বপ্নে চণ্ডীর দেখা পান এবং চণ্ডীমাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য রচনার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তারপর চণ্ডীর আদেশে তিনি শিলাই নদী অতিক্রম করে আড়রায় উপস্থিত হন।

আড়রার ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায় কবিকে আশ্রয় দেন এবং তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করেন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায় রাজা হন। রঘুনাথ রায় কবিকে 'অভয়মঙ্গল' কাব্য রচনার জন্য অনুরোধ করেন। রঘুনাথ রায়কে কবি তাঁর কাব্যে 'গুণে অবদাত, রসিক মাঝে সুজান,' বলে উল্লেখ করেছেন। কবি যে তাঁর সভাসদ ছিলেন তারও উল্লেখ আছে—

"তার সভাসদ, রচি চারুপদ, শ্রীকবিকঙ্কন গায়।"

কবির কাব্যে কাব্য রচনাকালের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা বিভ্রান্তিকর আগেই বলা হয়েছে। কোন কোন মুদ্রিত পুঁথিতে নিম্নোক্ত শ্লোকটির উদ্ধৃতি রয়েছে।

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা ॥

শ্লোকটির অর্থ করলে দাঁড়ায় (শশাঙ্ক—১, বেদ—৪, রস—৯) ১৪৯৯ অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু এই সময় কবির উক্তি অনুযায়ী মানসিংহের শাসন কাল। ইতিহাসে মানসিংহের শাসনকাল ১৫৯৪ খ্রীঃ হতে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মানসিংহের শাসনকাল উপরোক্ত শ্লোকটির সময়সীমার মধ্যে পড়ে না। আবার রঘুনাথের রাজত্বকাল অনুমিত হয় ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ফলে কোন সময় সীমা কবির কাব্য রচনাকালের আওতায় আসে না। এজন্য উপরোক্ত শ্লোকটির প্রামাণিকতার অভাব আছে বলে মনে হয়। গবেষকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুকুন্দরামের কাব্য রচনার কাল অনুমিত হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অংশে।

মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করলেও মনে হয় কৌলিক ধর্ম বিশ্বাসে তিনি উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তবে চৈতন্যদেবের প্রভাব যে তাঁর ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করেছিল তা তাঁর কাব্যে দেখা যায়। তা ছাড়া তিনি কোন সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা আছন্ন ছিলেন না তাও তাঁর কাব্য হতে উপলব্ধি করা যায়। ডিহিদার মামুদ সরিপ দ্বারা বাস্তুচ্যুত হলেও মুসলমান সমাজের উপর কবির কোন আক্রোশ তাঁর কাব্যে স্থান পায় নি। বরং কবি মুসলমান জীবন সম্পর্কে আগ্রহী ও উদার মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। শুধু তাই নয়, হিন্দু সমাজের সাধারণ এবং অন্ত্যজ শ্রেণী সম্বন্ধেও কবির উপেক্ষাহীন বর্ণনা পাওয়া যায়।

মুকুন্দরামের কাব্যে সমসাময়িক সমাজজীবনের সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। কবি কালকেতুর নগরপত্তন অংশে তৎকালীন সমাজে বসবাসকারী বহুজাতির সম্বন্ধে উদার ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয় ভিখারী শিবের সংসার যাত্রার পরিচয় দিতে গিয়ে কবি তৎকালীন বাঙালী জীবনের ছবি লিপিবন্ধ করেছেন। কবির সমাজ-চেতনা যে কত গভীর এবং বাস্তব ছিল তার পরিচয় এই অংশ হতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শিবের উক্তিটি লক্ষণীয়—

কালি ভিক্ষা করি দুঃখ পাইলুঁ ধামে ধামে।
আজি সকালে ভোজন করি রহিব বিশ্রামে॥

এর উত্তরে পার্বতী বলেছেন ঃ

কালিকার ভিক্ষানাথ উধার শুধিনু।
অবশেষে যেবা ছিল রন্ধন করিনু॥
রন্ধনের তরে ভাল করিলে গোঁসাই।
প্রথমে যে পাতে দিব সেই ঘরে নেই॥

এই প্রসঙ্গে শিবের ক্ষোভ খুবই মর্মস্পর্শী—

দেশে দেশে ফিরি কত ভিক্ষা করি
ক্ষুধায় অন্ন নাহি মিলে।
গৃহিণী দুর্জন, ঘর হৈল বন
বাস করি তরুমূলে॥

মুকুন্দরামের কাব্যের এই বাস্তব চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্পরস। তাই তাঁর কাব্য এত বেশি উপভোগ্য।

চরিত্র সৃষ্টিতে মুকুন্দরাম মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ফুল্লরা কালকেতু, মুরারী সীল, ভাড়ু দত্ত, বুলান মণ্ডল তাঁর সৃষ্ট অপূর্ব চরিত্র। চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি সে যুগের সমাজচিত্রও তুলে ধরেছেন নিপুণভাবে। ফুল্লরার চরিত্রের মধ্যে ব্যাধ নারী জনিত সারল্য যেমন আছে তেমনি ফুটে উঠেছে সে যুগের বাঙালী বধূর জীবন-আলেখ্য। সতীন রূপী দেবী চণ্ডীকে তাড়াবার জন্য ফুল্লরা তার 'বারমাস্যা' বর্ণনা করেছে। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন দারিদ্র্য-প্র-পীপ্রিত সমাজ জীবনের ছবি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফুল্লরা দেবী চণ্ডীকে বলেছে তারা এত দরিদ্র যে তাদের ভাতের 'আমানি' খাওয়ার কোন পাত্র নেই—সেটুকু তারা মাটিতে গর্তে ঢেলে খায়।

'আমানি খাওয়ার গর্ত দেখ বিদ্যমান।'

অন্যত্র ফুল্লরা যখন বলে,

বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী॥

তখন কবির বাস্তব চেতনা আমাদের সত্যিই বিস্মিত করে। কালকেতুর একটি উক্তি হতে সে যুগের সমাজের সতীন কোন্দলের এক বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। চণ্ডীকে তাড়াতে না পেরে ফুল্লরা কাঁদতে কাঁদতে কালকেতুর কাছে উপস্থিত হলে কালকেতু তাকে বলেছে ঃ

শাশুড়ী ননদী নেই নেই তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কইলি রাতা॥

ভাঁড়ু দত্ত মুকুন্দরামের মৌলিক সৃষ্টি। সব যুগের সমাজে ভাঁড়ু দত্তের মত ধূর্ত প্রকৃতির লোক দেখা যায়। মুরারী শীল মুকুন্দ-কবি প্রতিভার আর একটি অনবদ্য ফসল। কবি মুরারী শীলের চরিত্র চিত্রণে শিল্পরসের অপূর্ব পরিমিতি বোধের পরিচয় দিয়েছেন। মুরারী শীল কালকেতুকে ঠকাবার জন্য দেবী চণ্ডীর দেওয়া বহুমূল্য আংটিটি নেড়ে চেড়ে বলেছে ঃ

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু কর্য়াছ উজল॥

কিন্তু, এই মহামূল্য আংটিটি যখন হাতছাড়া হবার উপক্রম তখন মুরারী কালকেতুকে বলেছে—

'এতক্ষণ পরিহাস কৈলু ভাইপোরে।'

চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে কবি অপূর্ব হাস্য রসের অবতারণা করেছেন। শুধু তাই নয়—ছন্দ ও অলংকারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবির কৃতিত্ব সর্বাধিক। পরিশীলিত জীবন-বোধ ও উচ্চাঙ্গের রুচি কবির কাব্যকে শিল্প সুষমা দান করেছে। কবির ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যকে ব্যাষ্টি জীবন চেতনার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিছক দুঃখকে আশ্রয় করে তিনি কাব্য রচনা করেন নি; সুখ ও দুঃখের মিশ্র অনুভূতি তার কাব্যে আর এক অনবদ্য সম্পদ। রোমান্টিকতার পরিবর্তে বাস্তবতাই তাঁর কাব্যের মূল উপজীব্য ছিল। ক্ষুদ্র নয়, খণ্ড নয়—তিনি অখণ্ড জীবন-রসের কবি ছিলেন। মধ্য যুগের কাব্যে তাঁর অবদান তাই যুগের পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে।

চরিত-সাহিত্য

অষ্টম অধ্যায়

চৈতন্য জীবনী সাহিত্যের প্রধান কবি ও কাব্য পরিচয় বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ

ভূমিকা

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে তাঁর চরিত্র এবং ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা আমাদের সমাজ, সাহিত্য ও ধর্মীয় জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। চৈতন্যদেবের জীবৎকালেই এই প্রভাব সর্বস্তরে সূচিত হয়েছিল। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর জীবনলীলাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশাল সাহিত্য সম্ভার গড়ে ওঠে। এগুলিই মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে চৈতন্য-জীবনীকাব্য অথবা চরিত-সাহিত্য নামে পরিচিত।

চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বন করে সংস্কৃত ভাষায় প্রথম কাব্য রচনা করেন বাঙালী কবি মুরারী গুপ্ত। তাঁর কাব্যের নাম দিল শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এবং সাধারণভাবে এই কাব্যটি মুরারী গুপ্তের কড়চা নামে পরিচিত। সংস্কৃত ভাষায় রচিত পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কাব্য পরমানন্দ সেন অথবা কবি কর্ণপুরের তিনখানি গ্রন্থ। ১. চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, ২. চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য ও ২. গৌর গণদ্দেশ-দীপিকা।

উপরোক্ত সংস্কৃত কাব্যগুলি অনুসরণ করে পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে চরিত-সাহিত্যের ধারাটি প্রবাহিত হয়। এই পর্যায়ের কবিদের কাব্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত',
২. লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল',
৩. জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গল',
৪. কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত',
৫. গোবিন্দ দাসের কড়চা,
ও ৬. চূড়ামণি দাসের 'ভুবন মঙ্গল' (গৌরাঙ্গ বিজয়)।

চৈতন্য জীবনীমূলক উপরের কাব্যগুলির সামগ্রিক রূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলা চরিতকাব্য শাখা। কিন্তু বর্তমান অধ্যায়ে পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী কেবলমাত্র বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত', লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল', জয়ানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' আমাদের আলোচ্য বিষয়।

১. বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত'।

বাংলা ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম চৈতন্য চরিত কাব্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের "শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত।" বৃন্দাবন দাসের কাব্যের নাম প্রথমে ছিল 'চৈতন্য মঙ্গল'।

শোনা যায়, পরবর্তীকালে বৃন্দাবন জননী নারায়নী পুত্রের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে 'চৈতন্য ভাগবত' রাখেন।

"চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্য মঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ভাগবত আখ্যা দিল"। প্রেম-বিলাস।

এইরূপ নাম করণের কারণ এই যে বৃন্দাবন দাস শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলা অনুসরণ করে চৈতন্যলীলা বর্ণনা করেছেন।

বৃন্দাবন দাসের আবির্ভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। তিনি বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই গ্রামেই হয়ত তিনি কাব্যরচনা করেছিলেন। তাঁর মাতা নারায়নী শ্রীনিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। অনেকের অনুমান মহাপ্রভুর তিরোধানের দু'বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা বালবিধবা ছিলেন। বৃন্দাবন দাসের কাব্যে উল্লেখ আছে চৈতন্যদেবের গয়া হতে ফেরার পথে নারায়নী তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্যদেবের গয়া হতে ফেরার সন ১৪৪০ শক।

বৃন্দাবন দাসের কাব্য রচনাকাল সম্বন্ধেও পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। তবে গ্রন্থখানি মুরারী গুপ্তের চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদারের মতে তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৫৪৬ খ্রীঃ থেকে ১৫ ০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

চৈতন্য ভাগবত আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদি খণ্ডে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হতে গয়া পর্যন্ত গমন, মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত এবং অন্ত্য খণ্ডে নীলাচল গমন এবং সেখানকার লীলার আংশিক বর্ণনা রয়েছে। অন্ত্যখণ্ড আকস্মিকভাবে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর কাব্যে অন্ত্যখণ্ডের অসম্পূর্ণতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণনে হৈল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥

বৃন্দাবনদাস বিশেষভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর প্রেরণা ও নির্দেশে কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন—

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্য চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥

গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর উপরই নির্ভর করেছিলেন সবচেয়ে বেশি। এক কথায় বলা চলে নিত্যানন্দ প্রভুর বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাঁর কাব্যের মূলধন।

নিত্যানন্দ প্রভুমুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য॥

নিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্য জীবনের যে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন—তা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া তাঁর কাব্য। অন্য ক্ষেত্রে তিনি হয় ঘটনা সংক্ষেপ করে বর্ণনা করেছেন, অথবা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। তবে তাঁর কাব্যে মহাপ্রভুর গৌড়-ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিশেষ তথ্যসমৃদ্ধ এবং ইতিহাস নিষ্ঠ। কিন্তু বাল্যলীলা অংশটি পল্লবিত এবং অনৈতিহাসিক।

কিন্তু তা হলেও বৃন্দাবন দাসের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম চরিত কাব্য। দ্বিতীয়তঃ এ কাব্যের সমসাময়িক স্থানের ঐতিহাসিকতা আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ। বিশেষ করে মহাপ্রভুর গৌড়লীলা বর্ণনার সময় সমসাময়িক নবদ্বীপের এবং তার কাছাকাছি অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িক নবদ্বীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—

'সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-বসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজায় কেহ নানা উপাহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥
নানাবিধ নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥

তাঁর কাব্যের ভক্তিরস এবং নিষ্ঠা সব কিছুই তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ ও রসবদ্ধ করে তুলেছে। তা' ছাড়া বৈষ্ণব তত্ত্ব ও ধর্মের নানা কথা তাঁর কাব্যে বিশেষ স্থান পেয়েছে। সমগ্র কাব্যটি পয়ার ছন্দে লেখা। কোথাও কোন আড়ম্বর অথবা ভাষার চাকচিক্য নেই। এই সব কারণে চৈতন্যভাগবত বৈষ্ণবধর্মের ভাগবত হয়ে উঠেছে। তাই চৈতন্য চরিতামৃত কাব্যে এই কাব্য প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে—

'চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস।'

এত প্রশংসা সত্ত্বেও এই কাব্যের ঐতিহাসিকতার অভাব ছাড়া আর একটি অভাব আছে তা হচ্ছে চৈতন্যজীবনের যথার্থ তথ্য। কবি অনেক স্থলে শোনা কথা এবং কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করেছেন। যার ফলে কাব্যটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীকাব্যের মর্যাদা লাভ থেকে বঞ্চিত।

২. লোচন দাসের 'চৈতন্য মঙ্গল'।

চৈতন্যজীবনী কাব্যের পরবর্তী কবি লোচন দাস। তাঁর কাব্যের নাম ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল',। লোচন দাসের কাব্যটি 'পাঁচালি' হিসেবে গীত হওয়ার জন্য রচিত হয়েছিল। কবি নিজে একথা স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর আত্মপরিচয় হতে জানা যায় কবি বর্ধমান জেলার কো-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম কমলাকর দাস এবং মাতার নাম সদানন্দী। কবি ছিলেন বৈদ্যবংশীয়। কবির মাতামহ ও মাতামহী ছিলেন

যথাক্রমে পুরুষোত্তম গুপ্ত এবং অভয়া দাসী। কবি বাল্যকালে মাতামহের প্রেরণায় লেখাপড়া শেখেন। চৈতন্যদেবের অন্যতম অনুচর শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। তিনি বাংলাদেশে 'গৌর নাগরী' মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। লোচন দাস গুরুর এই 'গৌর নাগরী' মতবাদের সমর্থক ছিলেন। তাঁর রচিত চৈতন্যজীবনী কাব্যে এই মতবাদের প্রচুর সমর্থন পাওয়া যায়।

লোচন দাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সংশয় আছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করেছেন যে লোচন দাস ১৫২৩ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু এই অনুমান তথ্যনির্ভর নয়। তাঁর কাব্যরচনার কাল সম্পর্কেও অনুরূপ সংশয় দেখা যায়। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে লোচনের কাব্য ১৫৬০ খ্রীঃ হতে ১৫৬৫ খ্রীঃ-র মধ্যে লিখিত হয়েছিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কাব্যটির রচনা কাল ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে।

লোচন দাস মুরারী গুপ্তের সংস্কৃত কাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলায় চৈতন্যজীবনী কাব্য বচনায় ব্রতী হন। তিনি নিজে এ বিষয়ে স্বীকার করেছেন—

শ্লোকবন্ধে হৈল পুঁথি গৌরাঙ্গ চরিত।
দামোদর সংবাদ মুরারি মুখো দিত॥
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পিরীত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ চৈতন্যচরিত॥

মুরারী গুপ্তের কাব্যের ঐতিহাসিক বর্ণনাকে আশ্রয় করে কবি নূতন কল্পনার অভিনবত্বে কাব্যখানিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। মুরারীগুপ্তের কাব্যের খণ্ড ছিল তিন। কবি এই তিন খণ্ড ভেঙে কাব্যটিকে চারখণ্ডে বিভক্ত করেন। ১. সূত্রখণ্ড, ২. আদিখণ্ড, ৩. মধ্যখণ্ড এবং ৪. অন্ত্যখণ্ড।

সূত্রখণ্ডটি মধ্যযুগীয় মঙ্গল কাব্যের ধাঁচে হরি-নারদ, কৃষ্ণ-রুক্মিণী, হর-পার্বতী, ব্রহ্মা-নারদ ইত্যাদি দেব বন্দনার বর্ণনা রয়েছে। আদি খণ্ডে চৈতন্যদেবের, জন্ম হতে গয়া গমন এবং প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে। মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস, পুরীযাত্রা এবং সার্বভৌম কাহিনী রয়েছে। অন্ত্যখণ্ডে চৈতন্যদেবের তীর্থভ্রমণ এবং নীলাচলপর্ব ও তিরোধানের কথা আছে। তবে এই খণ্ডটি অসম্পূর্ণ।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের চৈতন্যদেবের মানবিক মহিমা বিকাশের কোন অবকাশ ছিল না। তিনি চৈতন্যদেবের জীবনের উপর দেব মহিমা আরোপ করতে গিয়ে নানা অলৌকিক কাহিনীর অবতারণা করেছেন। ফলে তাঁর কাব্য হতে ব্যক্তি চৈতন্যদেবকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। সর্বোপরি গৌর নাগরী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কবি বহুক্ষেত্রে ঐতিহাসিকতা রক্ষা করতে পারেন নি। এই সব কারণের জন্য বৈষ্ণবভক্ত সম্প্রদায় তাঁর কাব্যকে তুলনামূলক ভাবে বেশি অপছন্দ করেন।

তবে লোচনদাসের কাব্যে উপরোক্ত ত্রুটি থাকলেও কাব্যমূল্য কম নয়। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর কাব্য সম্বন্ধে সুন্দর অভিমত প্রকাশ করেছেন—"…লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে অনেক স্থলে কবিত্বের সৌন্দর্য আছে। ইতিহাসের রেখাঙ্কিত প্রস্তর খণ্ডের নিস্ফল খোঁজে পাঠক বিরক্ত হইলে পথে পথে কল্পনা বনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাধবী ও কুন্দ কুসুম কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহার শ্রম অপনোদনে সাহায্য করিবে।" সর্বত্র না হলেও তাঁর কাব্যের যত্র তত্র এই ক্ষুদ্র মাধবী ও কুন্দ কুসুমের সৌন্দর্য লীলা প্রত্যক্ষ করা যায়। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের আগে বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর বেদনা উপরোক্ত উক্তির সমর্থন করে—

অরণ্য কণ্টক বনে কোথা যাবে কোন স্থানে,
কেমনে হাঁটিবে রাঙা পায়।
ভূমিতে দাঁড়াও যবে, প্রাণে মোর ভয় তবে
হেলিয়া পড়য়ে পাছে গায়॥
কি কহিব মুই ছার আমি তোমার সংসার
সন্ন্যাস করিবে মোর তরে।
তোমার নিছনি লৈয়া মরি যাব বিষ খাইয়া
সুখে তুমি বঞ্চ এই ঘরে॥

৩. জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'

জয়ানন্দের কাব্যের নাম 'চৈতন্যমঙ্গল'। কাব্যখানি বৈষ্ণবদর্শনের সঙ্গে সব সময় সামঞ্জস্য রক্ষা করে নি বলেই একে প্রামান্য বলে মনে করা হয় না। কিন্তু এই কাব্যে চৈতন্য-জীবনী সম্বন্ধে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য মিলে যা অন্যজীবনী কাব্যগুলিতে অনুপস্থিত। সে সময়কার সমাজ সম্বন্ধেও অনেক তথ্য এ কাব্যটিতে পাওয়া যায়।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যটি দীর্ঘদিন বৈষ্ণব-সমাজে অপরিচিত ছিল। তাঁর কাব্য প্রসঙ্গে অন্য কোন বৈষ্ণব আকার গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় না। কাব্যটি বর্তমান কালে আবিষ্কৃত এবং মুদ্রিত হয়েছে। কবি কাব্য মধ্যে নিজের আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন। বর্ধমানের নিকট আমাইপুরা গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে জয়ানন্দের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র এবং মাতার নাম রোদনী দেবী। সুবুদ্ধি মিশ্র চৈতন্যভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে গৌড়ে ফেরার পথে অথবা গৌড় হতে নীলাচল ফেরার পথে সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তখন এক বছরের শিশু জয়ানন্দকে কোলে নিয়ে রোদনী দেবী চৈতন্যদেবের ভোগ রান্না করেছিলেন। শিশুকালে তাঁর নাম ছিল 'গুইঞা'। স্বয়ং চৈতন্যদেব তাঁর নাম করণ করেন জয়ানন্দ। তিনি অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন। কারণ কাব্যমধ্যে তিনি নিজেকে 'অভিরাম গোসাঞির দাস' বলে অভিহিত করেছেন।

জয়ানন্দের কাব্যের রচনা কাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে, জয়ানন্দ নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত রচনার পরেই তিনি কাব্য রচনা করেছেন। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার অনুমান করেছেন ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে অথবা তার পরে জয়ানন্দের কাব্য রচিত হয়েছিল।

জয়ানন্দের কাব্য নয় খণ্ডে বিভক্ত; আদি, নদীয়া, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, উৎকল, প্রকাশ, তীর্থ, বিজয় ও উত্তর। আগেই বলা হয়েছে তিনি পুরোপুরি ইতিহাস আশ্রয় করে কাব্য রচনা করেন নি। বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কাব্যমধ্যে পুরোপুরি নিষ্ঠা বজায় রাখেন নি। কোথাও কোথাও শক্তি ভাবনা চিন্তার প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁর কাব্যের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে চৈতন্যদেবের তিরোভাব কাহিনীর উল্লেখ। যতগুলি চৈতন্য-জীবনী কাব্য পাওয়া যায়, তার কোনটিতে চৈতন্যদেবের তিরোভাব কাহিনীর যথার্থ উল্লেখ নেই। জীবনীকারগণ হয়ত মহাপ্রভুর মৃত্যুলীলা প্রকাশ করতে চান নি। কিন্তু জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের তিরোভাব প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, আষাঢ়ের রথযাত্রার দিনে রথের সম্মুখে নৃত্য করার সময় মহাপ্রভুর বামপায়ে ইটের টুকুরো বিঁধে যায়। পরে পায়ের যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। তখন তিনি নিজেই ইহধাম ত্যাগ করেন।

আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে।
ইটল বাজিল বাম পাএ আচম্বিতে॥
চরণ বেদনা বড় ষষ্ঠির দিবসে।
সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে॥
পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।
কালি দশ দণ্ড রাত্রি চলিব' সর্বথা॥
... ...
মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি।
চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি॥

চৈতন্যদেবের তিরোধানের কাহিনী ছাড়া আরো এমনি কিছু কিছু নূতন তথ্য তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। তবে সব তথ্য ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে না। চৈতন্য-জীবনী বর্ণনায়ও ঠিকমত সময়ের অনুক্রম মানা হয় নি। এই সব নানা কারণে তাঁর কাব্য জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করে নি।

৪. কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত'

চৈতন্য জীবনী-কাব্যগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'। চৈতন্য জীবনীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রামান্য, তথ্যনির্ভর এবং সুলিখিত গ্রন্থ এটি। চৈতন্যদেবের শেষ বার বছরের লীলা-চরিত কেবলমাত্র এই কাব্যটিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেমন তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। এই বৈষ্ণবীয়তার জন্য, শোনা যায়, তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। জীবনের শেষ অধ্যায়ে পরিণত জ্ঞানও অভিজ্ঞতার অভিসেচনে গভীরনিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন। সে দিক হতে এই কাব্যে চৈতন্যদেবের যেমন সমগ্র জীবনের প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায়, তেমনি বৈষ্ণব তত্ত্বও দার্শনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই এটিকে আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের আত্মপরিচয় হতে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। নৈহাটির নিকট ঝামাটপুর গ্রামে তাঁর বাসভূমি ছিল। অনেকে ঝামাটপুর বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। কবির পিতার নাম ভগীরথ এবং মাতার নাম সুনন্দা। তাঁর ভাইয়ের নাম ছিল শ্যামদাস। কবি নিত্যানন্দ কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বৃন্দাবন যান এবং সেখানে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর আশীর্বাদ লাভ করেন ও রঘুনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। কেউ কেউ ১৫১৭খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং ১৫৩৭শকে তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন বলে মনে করেন।

কবি 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' রচনার আগে সংস্কৃত দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেন। এক, 'সারঙ্গ রঙ্গদা' এটি কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা এবং দুই, 'গোবিন্দ লীলামৃত' মহকাব্য। বলা বাহুল্য তিনি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র,কাব্য, ব্যাকরণ ইত্যাদিতে সুপণ্ডিত ছিলেন।

কবিরাজ গোস্বামীর চরিতগ্রন্থখানি সুবৃহৎ। আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিনটি লীলাখণ্ডে কাব্যটি বিভক্ত। আদিলীলা অংশে সতেরোটি পরিচ্ছেদ আছে; তার মধ্যে ন'টি পরিচ্ছেদে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের মূল কথা আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে মহাপ্রভুর জন্ম হতে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত কাহিনী আলোচিত হয়েছে। মধ্যলীলা অংশে পঁচিশটি পরিচ্ছেদ আছে। এই অংশে চৈতন্যদেবের দীর্ঘ ছ'বছর ব্যাপী তীর্থ ভ্রমণকাহিনী এবং সাধ্য-সাধন তত্ত্বের কথা আছে। অন্ত্যলীলায় মহাপ্রভুর 'দিব্যোন্মাদ' বর্ণিত হয়েছে। এই অংশে কবি স্বরূপ দামোদরের কড়চা এবং রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাসের রচিত শ্লোক মালা হতে প্রচুর সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে কবিরাজ গোস্বামী পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কাব্যের ছত্রে-ছত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃত কাব্য, নাটক প্রভৃতি হতে তিনি বহু উদ্ধৃতি তাঁর কাব্যে দিয়েছেন। তা ছাড়া অনেক জটিল বৈষ্ণব দার্শনিক তত্ত্বের তিনি সহজ ও সরল ব্যাখ্যা করেছেন। কোথাও পাণ্ডিত্যের অভিমান প্রকাশ করেন নি বরং বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশ করেছেন।

সব শ্রোতাগণের করে চরণ বন্দন।
যা সভার চরণ-কৃপা শুভের কারণ॥

চৈতন্য চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর পূর্বসূরিগণের ঋণের কথা দীনতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। তবে কবিকর্ণপুরের অনুসরণ করেও তাঁর নামোল্লেখ কাব্যের কোথাও করেন নি। মনে হয়, স্বরূপ দামোদরের কড়চার আদর্শেই দুই কবি কাব্য রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্ত দুঃখের বিষয় স্বরূপ দামোদরের কড়চা আজও অনাবিষ্কৃত। তাঁর কাব্যে ভক্ত কবির ভক্তি-চেতনা ও ভক্তিরস চৈতন্য-জীবন ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করেনি বা অলৌকিক কাহিনী বর্ণনার দ্বারা চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ঢাকা পড়ে যায় নি। তিনি মূলত কাব্য রচনা করার প্রেরণা নিয়েই কাব্য রচনা করেছিলেন—পূর্বসূরিগণের মত পাঁচালি রচনায় ব্রতী হন নি। কিন্তু সত্যিকারের কবিত্বের প্রকাশ তাঁর কাব্যে খুবই কম। তবুও মাঝে মাঝে চকিত কাব্যরসের বিদ্যুৎ চমক পাঠকমাত্রকেই বিস্মিত করে। যেমন—

কৃষ্ণ প্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।

অথবা কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ সুচরিত,
সুধাসার স্বাদ বিনিন্দন।
তা'র স্বাদ যে না-জানে, জন্মিয়া না মৈলে কেনে,
সে রসনা ভেক জিহ্বা সম॥
মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্বমান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যা'র নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥

সঠিক কাব্যের বিচারে হয়ত দেখা যাবে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ছন্দের গরমিল আছে। কিন্তু ভক্তিরসের চমৎকারিত্ব সে ত্রুটি পাঠককে পীড়া দেয় না। চৈতন্য চরিত, বৈষ্ণব দর্শন এবং দুরূহ তত্ত্বের সংমিশ্রণে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে কাব্য রচনা করেছেন তা যুগ ও কালের বিচারে অনবদ্য। সব দিক বিচার করে ডঃ সুকুমার সেন তাই এই কাব্যটিকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চরিত-কাব্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের মৃত্যু সম্পর্কে একটি কাহিনী শোনা যায়। 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' কাব্যখানির মূল পুঁথি চুরি হওয়ায় কবি নাকি দুঃখে -আত্মহত্যা করেছিলেন। তবে এ ঘটনা কতদূর সত্য তা এখনও স্থির হয় নি। যাই হোক পণ্ডিত-গণের অনুমান কবি ১৬১৫ খ্রীঃ এর কাছাকাছি কোন সময় মৃত্যুবরণ করেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই জীবনী কাব্যটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই কাব্যটিই প্রথম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতার সীমা রেখা লঙ্ঘন করেছিল। কারণ এটি ছিল পাঠ্যকাব্য। কাব্যটিতে তত্ত্ব এবং দার্শনিকতা এত বেশি যে তা কোন মতে গীত হবার যোগ্য ছিল না। দ্বিতীয়তঃ দার্শনিকতা এভাবে এর আগে আর কখনো কাব্যের অঙ্গীভূত বিষয় হয়ে উঠে নি।

পদাবলী সাহিত্য

নবম অধ্যায়	বলরাম দাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাসের পদাবলী

॥ পদাবলী সাহিত্য ॥

বাঙালীর কাব্য চেতনায় পদাবলী একটি অপূর্ব সংরাবী শব্দ। এই শব্দটির দ্যোতনা পাঠক চিত্তকে সঙ্গীতের ঝর্ণাতলায় অবগাহনের ইঙ্গিত দেয়। কবে সেই কোন কালে দ্বাদশ শতকে জয়দেব "মধুর কোমল কান্ত পদাবলী" রচনা করেছিলেন। তারপর থেকে বাংলা সাহিত্যে 'পদাবলী' নামে ক্ষুদ্র অবয়বের ছোট ছোট কবিতা রচিত হয়েছে। তার বিষয়বস্তু রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় লীলা অথবা চৈতন্যলীলা। তখন এর নামকরণ হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী অথবা পদাবলী সাহিত্য। বৈষ্ণব কবিদের 'মহাজন' বলা হতো। তাই তাঁদের রচিত পদাবলীকে আবার 'মহাজন পদাবলী'ও বলা হতো। আরও পরে ঐ স্বল্প আয়তনের কবিতার বিষয়বস্তু যখন শক্তি বিষয়ক হয়েছে তখন তার নাম হয়েছে 'শাক্ত পদাবলী'। এইভাবে পদাবলী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

'পদাবলী' শব্দটি সমষ্টি বাচক। 'পদ' শব্দটি গান অর্থে ব্যবহৃত হতো। ফলে পদাবলী অর্থে গানের সমষ্টি বোঝায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পদাবলী শব্দটি গানের সমষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন—বিষ্ণু বিষয়ক গানের সঙ্কলন বৈষ্ণব পদাবলী ; শক্তি বিষয়ক গানের সঙ্কলন শাক্ত পদাবলী। যাইহোক, বর্তমানে পদাবলী বলতে আমরা বুঝি স্বল্পায়তনের কবিতা বা গানের সঙ্কলন।

বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। অনেকে একে গীতি কবিতা বলেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য আক্ষরিক অর্থে এবং প্রথাগত ভাবে গীতি কবিতা নয়। তা না হলেও, পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে কীর্তন গানের প্রসঙ্গটি জড়িত। রসপর্যায় অনুযায়ী কীর্তনীয়ারা পূর্বরাগ, অভিসার, মান ইত্যাদি বিভাগে সাজিয়ে গান করতেন। প্রাচীন কালে এর নাম করণ করা হয় 'পালা গান'। আধুনিক কালে 'পালা' শব্দটি 'বিষয়' শব্দের দ্যোতক। যেমন রাধা-কৃষ্ণের পালা, হর-গৌরীর পালা ইত্যাদি। একদা যা ছিল রসপর্যায়ের দ্যোতক বর্তমানে তা বিষয় বা কাহিনীর দ্যোতক হয়ে উঠেছে। 'পদ' এবং 'পালা'র মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তন খুঁজে না পাওয়া গেলেও উভয়ই গীত অর্থে ব্যবহৃত হত এবং এখনও সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর তিনটি ধারা সূচিত হয়েছে। এক. চৈতন্য-পূর্ব পদাবলী সাহিত্য, দুই. চৈতন্য সমসাময়িক পদাবলী সাহিত্য এবং তিন. চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্য। বলা বাহুল্য বিষয়গত দিক হতে এবং ভাবের দিক হতেও এই তিনটি ধারার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

চৈতন্য পূর্ব বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়বস্তু ছিল রাধা কৃষ্ণের প্রেম। তখন কবিরা নিতান্ত প্রথানুসারী ভাবেই রাধা কৃষ্ণের প্রণয় লীলা স্বল্পায়তনের কবিতার মাধ্যমে রচনা করতেন। বিশেষ কোন ধর্মীয় প্রেরণার দ্বারা উদ্বোধিত হয়ে কবিরা রাধাকৃষ্ণের পদ রচনা করতেন না। কারণ একই কবি যেমন রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা করেছেন তেমনি গণেশ অথবা হর-পার্বতী বিষয়ক পদও তিনি রচনা করেছেন। তা ছাড়া চৈতন্য পূর্ববর্তী পদাবলী সাহিত্যে বৈষ্ণব দর্শনের আধ্যাত্মিক দিকটি খুব সোচ্চার ছিল না যেমন সোচ্চার ছিল এর সঙ্গীতময়তার দিকটি।

কিন্তু ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে এবং তাঁর নবপ্রবর্তিত মানবিক ধর্ম প্রচারের ফলে বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্নিহিত ফলগুধারা আপামর জনমানসে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের রূপ গ্রহণ করে। তখন কবিরা বৈষ্ণব পদাবলী রচনার পেছনে একটি ধর্মীয় প্রেরণা লাভ করল এবং ভক্তি সাধনার অঙ্গ হিসেবে পদাবলী সাহিত্য বিবেচিত হতে থাকল। শুধু তাই নয়, তখন থেকে পদাবলী সাহিত্যের আধ্যাত্মিক দিকটি বিশেষভাবে স্বীকৃত হতে থাকল। পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য হয়ে উঠলো।

যাঁরা চৈতন্য সমসাময়িক কবি তাঁরা চৈতন্যদেবের ব্যক্তি-জীবনের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের লীলাকে প্রত্যক্ষ করলেন। ভক্তিবাদের তারতম্য সূচিত হলো। এতদিন যা ছিল 'বৈধী' ভক্তি তা রূপান্তরিত হলো 'রাগানুগা' ভক্তিতে। এর আগে কৃষ্ণ ছিলেন ঐশ্বর্য শক্তির প্রতীক; অর্থাৎ তিনি ছিলেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শক্তিমান কৃষ্ণ। তিনি প্রেমিক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ভক্ত-চিত্তে তিনি ছিলেন ঐশ্বর্যরূপী। চৈতন্যদেবের মানবিক প্রেমের স্পর্শে কৃষ্ণের মাধুর্য দিকের প্রতিষ্ঠা শুরু হলো। কৃষ্ণ ভক্তের কাছের কখনো সন্তান, কখনো সখা, আবার কখনো প্রেমিক। পূর্ববর্তী কালে রাধার লৌকিক রূপ আধ্যাত্মিকতার আবরণে নূতনভাবে প্রকাশিত হলো। রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি অর্থাৎ আনন্দ স্বরূপ। কৃষ্ণের আর এক সত্ত্বা রাধা। নিজের প্রেম নিজেই আস্বাদন করার জন্য হ্লাদিনী শক্তি রূপে রাধার প্রকাশ।

তাছাড়া চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে আর একটি নূতন চিন্তা সংযোজিত হলো পদাবলী সাহিত্যে, তা হচ্ছে 'গৌরচন্দ্রিকা'। গৌর চন্দ্রিকার সূত্রপাত হয় চৈতন্যদেবের দিব্যলীলা দেখে। ভক্তেরা চৈতন্যদেবকে হয় কৃষ্ণের অথবা রাধার অথবা রাধা-কৃষ্ণের যুগল অবতার বলে মনে করতেন। চৈতন্যদেবের যখন দিব্যোন্মাদ অবস্থা দেখা দিত তখন তাঁর আচার-আচরণের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা প্রকাশ পেত। প্রত্যক্ষদর্শীরা চৈতন্যদেবের এই বিশেষ বিশেষ ভাবমূর্তিকে রাধা-কৃষ্ণের

প্রণয় লীলার বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন। তাই পরবর্তীকালে রাধা-কৃষ্ণ লীলা গান করার আগে তাঁরা রাধা ভাবের গৌর পদ আগে গেয়ে নিতেন। তারপর রাধা-কৃষ্ণ লীলায় প্রবেশ করতেন। রাধা-কৃষ্ণের এই গৌর অর্থাৎ চৈতন্যভাব সদৃশ পদগুলিকেই গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়।

চৈতন্য বিষয়ক সাধারণ পদগুলিকে বলা হয় চৈতন্যপদ অথবা গৌরপদ। এই পদগুলির বিষয়বস্তু চৈতন্যদেবের জীবনের বিভিন্ন অবস্থা এবং প্রকৃতি। এর সঙ্গে গৌরচন্দ্রিকার কোন মিল নেই। প্রথমটি চৈতন্য-জীবনের নানা পর্যায় সম্বন্ধীয় এবং দ্বিতীয়টি চৈতন্যের রাধাভাব সদৃশ পদ।

ফলে, চৈতন্য সমসাময়িক পদকর্তা ও চৈতন্য পরবর্তী পদকর্তাদের রচিত পদাবলীতে গৌরচন্দ্রিকার সংযোজন হওয়ায় চৈতন্য পূর্ববর্তী পদকর্তাদের রচিত পদাবলীর সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। আবার চৈতন্য সমসাময়িক পদকর্তাদের সঙ্গে চৈতন্য পরবর্তী পদকর্তাদেরও বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়ে। কারণ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে যা স্পষ্ট ও অভিজ্ঞতায় সজীব তা চৈতন্য পরবর্তী কবিদের রচনায় অনুভূতি নির্ভর। প্রত্যক্ষদর্শীরা যা সহজভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন চৈতন্য পরবর্তী কবিরা সেক্ষেত্রে দার্শনিকতা এবং অলঙ্কার ইত্যাদির আবরণ দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষা সহজ এবং সরল—চৈতন্য পরবর্তী কবিদের পদাবলীর ভাষা মাণ্ডনিকতায় এবং চাতুর্যকলায় পরিপূর্ণ। এই পার্থক্য শুধু চৈতন্যবিষয়ক পদে সূচিত হয় নি; রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনাতেও দেখা যায়। কারণ, চৈতন্য সমসাময়িক কবিগণ চৈতন্য-জীবনের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। চৈতন্যোত্তর যুগের কবিরা বৈষ্ণব তত্ত্ব ও দার্শনিকতার উপর নির্ভর করে কাব্য রচনা করেছেন।

চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের অন্যতম বৈষ্ণব কবি জয়দেব। যদিও তিনি সংস্কৃতে তাঁর 'মধুর কোমলকান্ত পদাবলী' রচনা করেছেন তবুও সে ভাষা অনেকাংশে বাংলার সমগোত্রীয় (Sanskritised vernacular)। জয়দেবের পরে নাম করতে হয় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের। পদাবলী সাহিত্যের অনন্য সাধারণ এই দুই কবির কবিতা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

চৈতন্য সমসাময়িক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুরারিগুপ্ত, নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ এবং বংশীবদন। এঁরা প্রত্যেকেই চৈতন্যদেবের ভাব-জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং তা অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন।

চৈতন্য পরবর্তী কালে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের মহাপ্রয়াণের পরে ষোড়শ শতকে যে সব বৈষ্ণব কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে বলরাম দাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ-দাস, রায় শেখর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা পদাবলী সাহিত্যে এই তিন শ্রেণীর কবি তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন এবং এঁদের রচনা সম্ভার নিয়ে গড়ে উঠেছে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য।

১. বলরাম দাস

চৈতন্যোত্তর ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে বলরাম দাস অন্যতম কবি। বলরাম দাস নামে বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক কবি আছেন। আমাদের আলোচ্য বলরাম দাস ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। তিনি কৃষ্ণনগরের নিকট মতান্তরে বর্ধমানের নিকট দোগাছিরা গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে বালগোপালের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বলরাম দাস পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। ইনি চৈতন্য দেব এবং গুরু নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে অনেক সুন্দর পদ রচনা করেছেন। চৈতন্য ভাগবতে তাঁর প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে ; "প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস"।

বলরাম দাস ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষায়ই পদ রচনা করেছেন। ব্রজবুলি অপেক্ষা বাংলা পদগুলিই উৎকৃষ্ট। বাৎসল্য রসের ক্ষেত্রে বলরাম দাসের কৃতিত্ব অধিক। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁকে অনেকে বাৎসল্য রসের কবি বলে থাকেন।

শ্রীদাম-সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতি দূর, নব তৃণ কুশাঙ্কুর,
গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে॥

সখাগণ আগে পাছে, গোপালে রাখিয়া মাঝে,
ধীরে ধীরে করহ গমন।
নব তৃণাঙ্কুর আগে, রাঙা পায়ে জানি লাগে
প্রবোধ না মানে মোর মন।
নিকটে গোধন রেখ্যো মা বলে শিঙ্গায় ডেক্যো,
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিহি কৈলে গোপ জাতি, গোধন পালন বৃত্তি
তেঁঞি বনে পাঠাই যাদব॥
বলরাম দাসের বাণী শুন ওগো নন্দরাণী,
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লইয়া, দিব আমরা যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥

বলরাম দাসের ভাষা সহজ এবং হৃদয়গ্রাহী। পদাবলী সাহিত্যে খুব কম কবিই এমনি হৃদয়গ্রাহী সহজ ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলরাম দাসের পদাবলীর অকুন্ঠ প্রশংসা করেছেন। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁকে কবিত্বের বিচারে জ্ঞান দাস ও গোবিন্দ দাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদে তাঁর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাধা-কৃষ্ণের

রূপানুরাগ বর্ণনায় তাঁর কুশলতা অনস্বীকার্য। একটি পদের আংশিক উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে দেওয়া হলো—

কিবা সে কহিব বঁধুর পিরীতি
তুলনা দিব যে কিসে।
সমুখে রাখিয়া মুখ নিরখয়ে
পরাণ অধিক বাসে॥
আপনার হাতে পান সাজাইয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
মোর মুখে দিয়া আদর করিয়া
মুখে মুখ দিয়া নেয়॥

এইসব পদ রচনায় বলরাম দাস প্রায় চণ্ডীদাসের নিকটবর্তী। আন্তরিকতায় বাৎসল্যে এবং প্রেমানুভূতির স্মৃতি চারণায় বলরাম দাস পদাবলী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

২. জ্ঞান দাস

মধ্যযুগের পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে জ্ঞান দাস অন্যতম। তিনি চৈতন্যোত্তর যুগের কবি ছিলেন। যতটুকু জানা যায় জ্ঞান দাস বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বংশে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য ছিলেন। গোবিন্দ দাস কবিরাজ ও বলরাম দাসের সঙ্গে তিনি নরোত্তম দাস আয়োজিত খেতুরীর বৈষ্ণব মহোৎসব ও কবি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। জাহ্নবীদেবীও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শোনা যায়, কবি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন এবং উচ্চাঙ্গের বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন।

পদাবলী রচনার ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি এমন কি বাংলা ও ব্রজবুলি মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর পদসংখ্যা অনেক বেশী। কিন্তু জ্ঞান দাস যে পদাবলীর জন্য চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে বিবেচিত হয়েছেন সেগুলি সবই বাংলা ভাষায় রচিত। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলি কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট। তা ছাড়া জ্ঞান দাস বৈষ্ণব রস পর্যায়ের সর্বস্তরে পদ রচনা করলেও সবক্ষেত্রে সমান কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। রূপানুরাগ ও আক্ষেপানুরাগের পদে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই জন্য অনেকে তাঁকে চণ্ডীদাসের সার্থক উত্তর সাধক বলে থাকেন। মূলতঃ চণ্ডীদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি কাব্য রচনা করেছেন।

জ্ঞান দাস রূপানুরাগের পদ রচনায় চণ্ডীদাসের মতই সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করেছেন। শ্রীরাধার রূপমুগ্ধতা তাই তাঁর কাব্যে অপরূপ হয়ে উঠেছে—

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥

ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥

অন্যত্র রাধা তাঁর সখিকে কৃষ্ণের রূপতন্ময়তার কথা বলেছেন—

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যেদিকে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হৈয়া
তখন সেদিকে ধায়॥

কিন্তু রূপানুরাগে বিভোর রাধার হৃদয়ে আক্ষেপের বহির্প্রকাশ কবি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিত লাগি থির নাহি বান্ধে॥

জ্ঞানদাসের কাব্যের এই আক্ষেপ অনুভূতি কতদূর সূক্ষ্ম হৃদয়বত্তার পরিচয় দেয় তা সহজেই অনুমেয়। আক্ষেপানুরাগের আর একটি পদ চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস দু'জনেরই ভনিতায় প্রচলিত। রাধার অন্তরের আর্তি কি নিবিড় বেদনা রসে এই পদটিতে প্রকাশ পেয়েছে তা সহজে অনুভব করা যাবে—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥

আত্মসমর্পনের পদ রচনায় জ্ঞানদাসের কৃতিত্ব কম নয়। রাধা যখন কৃষ্ণকে বলেন—

তোমার গরবে গরবিণী হাম,
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মন লয় ও দুটি চরণ,
সদা লয়্যা রাখি বুকে॥

তখন মনে হয় কবি ব্যক্তি-জীবনের মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণীরূপ দিয়েছেন পদাবলী সাহিত্যে। বৈষ্ণব পদ সাহিত্যে জ্ঞানদাস মিলন ও বিরহের পদ রচনায়ও কম দক্ষতা প্রকাশ করেন নি।

আগেই বলা হয়েছে জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের উত্তর সাধক ছিলেন। তবে ভাব, ভাষা এবং উপস্থাপনের ক্ষেত্রে দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। চণ্ডীদাস হৃদয় ধর্মের কবি; জ্ঞান দাস হৃদয়ের অন্তর্নিহিত রস ধর্মের কবি। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের মত অনুভূতি মাত্র সম্বল করে কাব্য রচনায় ব্রতী হননি। তাঁর মধ্যে অনুভূতির নিবিড়তা লক্ষ্য করা যায়। এই হিসেবে চণ্ডীদাস স্বভাব শিল্পী এবং জ্ঞানদাস মণ্ডন শিল্পী।

২. গোবিন্দ দাস

গোবিন্দ দাস কবিরাজ চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য ছিলেন। অনেকে তাঁকে বিদ্যাপতির উত্তর সাধক বলে থাকেন। কাব্য রচনার ক্ষেত্রে ভাব, ভাষার এবং ছন্দের দিক থেকে বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দ দাস কবিরাজ প্রায় এক বলে মনে হয়। সেজন্যে তাঁকে সেযুগে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলা হতো। কবি বল্লভ দাসের একটি পদে গোবিন্দ দাস কবিরাজ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে :—

"ব্রজের মধুর লীলা যা' শুনি দরবে শিলা।
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্ব গুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥"

জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দ দাস সমসাময়িক কবি ছিলেন। ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশকে তিনি শ্রীখণ্ডে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল চিরঞ্জীব সেন এবং মাতার নাম সুনন্দা। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিখ্যাত সংস্কৃত কবি ছিলেন। চিরঞ্জীব সেন ভক্ত এবং বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। কবির মাতামহ ছিলেন 'সঙ্গীত দামোদর' গ্রন্থের প্রণেতা দামোদর সেন। তিনি শাক্ত মতাবলম্বী ছিলেন। ফলে, প্রথম জীবনে গোবিন্দ দাস এবং তাঁর অগ্রজ শাক্ত ধর্মের অনুগামী ছিলেন। ১৪৯৯ শক অথবা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হলে দেবী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৫৩৫ শকে তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রথম জীবনে তিনি শাক্তপদ রচনা করেন। শেষ বয়সে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা লাভ করার পরই বৈষ্ণব পদ সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। গোবিন্দ দাস কবিরাজ ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন; তবে বাংলা অপেক্ষা ব্রজবুলিতে তাঁর কবিতার সংখ্যা বেশি। গোবিন্দ দাসের ভণিতায় যে সব বাংলা পদ পাওয়া যায় তা গোবিন্দ দাস চক্রবর্তী নামে আর এক বৈষ্ণব কবির রচনা বলে অনেকে অনুমান করে থাকেন। গোবিন্দ দাস চক্রবর্তী বাংলা এবং ব্রজবুলিতে বহু পদ রচনা করেছেন। সে সব পদের অনেকগুলি গোবিন্দ দাস কবিরাজের পদের সঙ্গে মিশে গেছে। গোবিন্দ দাস চক্রবর্তীর নিবাস ছিল বোরাকুলি গ্রামে। কিন্তু গোবিন্দ দাস কবিরাজ প্রথমে কুমার নগর পরে তেলিয়াবুধুরি গ্রামে বসবাস করতেন। দুই কবিই খেতুরির মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবে গোবিন্দ দাস কবিরাজের সঙ্গে জ্ঞানদাস এবং বলরাম দাসের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁর পদাবলী পড়ে বৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে 'কবীন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

গোবিন্দ দাস চৈতন্য বিষয়ক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম রসতত্ত্বের প্রকাশ করেছেন এবং চৈতন্যদেবের ভাবমূর্তি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন ঃ—

কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর ॥

পূর্বরাগের কবিতায় কবি কৃষ্ণের পূর্বরাগের চিত্রটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ঃ—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকিত হোতি ॥
যাঁহা যাহা অরুণ চরণ চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই ॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহিঁ খেলি ॥

কবির বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে এবং বৈষ্ণব দর্শনে পাণ্ডিত্য ছিল। রস পর্যায়ের বর্ণনা ক্ষেত্রে রূপানুরাগ এবং অভিসারের পদ রচনায় তাঁর কবি-প্রতিভার চরম প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষ করে অভিসারের পদ রচনায় তিনি বিদ্যাপতিকে অতিক্রম করে গেছেন। তিনি নানা আঙ্গিকের অভিসারের পদ রচনা করেছেন। শ্রীরাধার অভিসারের প্রস্তুতি-পর্ব অতি দক্ষতার সঙ্গে নিপুন ছন্দ্যো বৈচিত্র্যে উপস্থাপন করেছেন। শ্রীরাধা বর্ষার পিচ্ছিল পথে অভিসারে যাওয়ার জন্য মাটিতে কাঁটাপুঁতে জল ঢেলে উঠোন পিচ্ছিল করেছেন এবং তার উপর দিয়ে হাঁটা অভ্যেস করেছেন—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহিঁ ঝাপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধই
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥

শুধু তাই নয়, এই অভিসারে যেতে গেলে সংসারের অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে হবে। তার উপরে আছে ঘনঘোর বর্ষা—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে পঙ্কিল শঙ্কিল বাট ॥
তঁহি অতি দূরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনীপার ॥

বাদল অভিসারের বর্ণনায় কবি যে প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করেছেন তা অপূর্ব ঃ

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম করি জাত ॥

দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকত লোচন তার॥
ইথে যব সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখব দেহ॥

অন্য একটি পদে কবি শ্রীরাধাকে অভিসারে যাওয়ার জন্য নীল রাত্রির রূপের সঙ্গে নিজের আভরণ এবং আবরণ মিলিয়ে নিয়েছেন। গোবিন্দ দাস অপূর্ব মন্ডন সুষমায় শ্রীরাধার অভিসারিকা রূপ বর্ণনা করেছেন—

নীলিম মৃগমদে তনু অনুলেপন
নীলিম হার উজোর।
নীল বলয় গণে ভুজ যুগ মণ্ডিত
পরিহণ নীল নিচোল॥

গোবিন্দ দাসের কবিতায় মিলনের চিত্রে একটি স্নিগ্ধ মাধুর্যের রূপ খুঁজে পাওয়া যায়—কোনরূপ তীব্রতা বা চাপল্য দেখা যায় না।

তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূরে গেল॥
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লুঁ গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণ করি গণলুঁ
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

মাথুর, ভাবোল্লাস, নিবেদন প্রভৃতি রসপর্যায়ের ক্ষেত্রে গোবিন্দ দাস অনেক পদ রচনা করেছেন। তাঁর সমস্ত পর্যায়ের পদের মধ্যে চৈতন্যোত্তর যুগের সূক্ষ্মভাব এবং মন্ত্রনকলার স্নিগ্ধ মাধুর্য বর্তমান। বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য হলেও গোবিন্দ দাসের কবিতায় যে গভীরতা আছে তা বিদ্যাপতির কবিতায় নেই। অভিসারের কবিতা রচনায় বিদ্যাপতির পদে বৈচিত্র্য থাকলেও সাধকের আকুতি ছিল না। গোবিন্দ দাসের কবিতায় ভক্তি ও কাব্যরসের মেলবন্ধন ঘটেছে। বিদ্যাপতির সম্মুখে জয়দেবের রাধার আদর্শ ছিল এবং সংস্কৃত রসশাস্ত্রের উজ্বল দৃষ্টান্ত ছিল। কিন্তু গোবিন্দ দাসের অবলম্বন ছিল ভক্তি-সাধনার সঙ্গে কাব্যসাধনার দিকটি। তাই বিদ্যাপতির অভিসারিকা রাধার সঙ্গে গোবিন্দ দাসের অভিসারিকা রাধার পার্থক্য চোখে পড়ে এবং এই জন্যে বোধহয় গোবিন্দ দাসের রাধা বলতে পারেন—

মম হৃদয় বৃন্দাবনে কানু ঘুমায়ল,
প্রেম-প্রহরী রহঁ জাগি।
অথবা তুয়া দরশন আশে কিছু নাহি জানলুঁ
চির দুখ অব দূর গেল॥

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দ দাসের কবিতার শিল্প-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। ছন্দ ও মাধুর্য গোবিন্দ দাসের কবিতার প্রধান আকর্ষণ এবং এর সঙ্গে মিশে আছে ভক্তি সাধনার স্নিগ্ধ রস।

ধর্মমঙ্গল-কাব্য

দশম অধ্যায় | ধর্মমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রধান কবি ও কাব্যের পরিচয়। রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী

ভূমিকা

ধর্মমঙ্গলকাব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কথা। আমাদের দেশে ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। তবে ডোমজাতির মধ্যে ধর্মঠাকুরের পূজা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। শুধু তাই নয়, ধর্মঠাকুরের পূজা সীমাবদ্ধ ছিল প্রধানতঃ রাঢ় অঞ্চলেই। পশ্চিমবঙ্গে অন্য অঞ্চলে এই দেবতার পূজার প্রচলন উল্লেখযোগ্য ভাবে কম।

ধর্মঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়েছে। কেউ কেউ ধর্মঠাকুরের পেছনে বৌদ্ধ দেবতার প্রভাব আছে বলে মনে করেছেন। অনেকে ধর্মঠাকুরকে সূর্য দেবতা বলেও অনুমান করেছেন। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন। 'ধর্মঠাকুর মূলতঃ ছিলেন প্রাক্ আর্য আদিবাসী কোমের দেবতা, পরে বৈদিক ও পৌরাণিক দেশী ও বিদেশী নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্মঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে।' ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি কূর্মবাচক অষ্ট্রিক শব্দ 'দড়ম' থেকে উদ্ভব হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এই আলোচনা হতে ধারণা করা যায় ধর্মঠাকুর আর্যেতর দেবতা।

ধর্মঠাকুরের কাহিনী হতে দেখা যায় যে এই দেবতার উপর হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিরই প্রভাব বেশি। আসলে ধর্মঠাকুর অন্ত্যজ শ্রেণীর সাংস্কৃতিক বলয় হতে ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে হিন্দু জমিদারদের পূজা পেতে আরম্ভ করেন এবং ধর্মঠাকুরের পূজার রীতি নীতিও বদল হতে থাকে। মন্দির স্থাপিত হয় এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা বিষ্ণুমন্ত্রে অথবা শিবমন্ত্রে পূজিত হতে থাকেন। ত্রয়োদশ শতকে ধর্মঠাকুরের পূজার ডোমপুরোহিত ছিলেন রামাই পন্ডিত। রামাই পণ্ডিতের পূজার স্থান ছিল বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রামে। ঐ গ্রামে আজও ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে। ধর্মঠাকুরের পূজার্চনার রীতিনীতি কালক্রমে শিব পূজার রীতিনীতি হবে গ্রহণ করতে থাকে। শিব পূজার আনুসাঙ্গিক গাজন এবং ভক্ত বা সন্ন্যাসদের পালনীয় কর্তব্য ধর্মঠাকুরের ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে।

মূর্তি পরিকলপনার ক্ষেত্রে দেখা যায় ধর্ম দেবতার কোন নির্দিষ্ট মূর্তি নেই। ধর্মশিলাই হলো সমূহ ক্রিয়া কাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে। শিলার গড়ন নানা রকমের হয়। মিশরের 'ওসাইরিসের' পূজার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজার যথেষ্ট মিল আছে।

'ওসাইরিস' ছিলেন শস্য দেবতা। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "পৌরাণিক কাহিনীতে ধর্মকে বৃষ কল্পনা করা হয়েছে। সত্যযুগে তাঁর চার পা ছিল।" মনে হয় এই সব কারণে ধর্ম ঠাকুর ও শিব ঠাকুরের পূজারীতি প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে।

ধর্ম ঠাকুরকে নিয়ে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে কাব্যসম্ভার গড়ে উঠেছিল তা ধর্মমঙ্গল নামে পরিচিত। ধর্মঠাকুরের উদ্ভব এবং পূজা পার্বনের কথা রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণে' উল্লেখ আছে। ধর্ম মঙ্গল কাব্যের কাহিনী দুটি। এক রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী, এবং দুই. লাউ সেনের কাহিনী।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী অপেক্ষা লাউসেনের কাহিনীই বিশেষ প্রচলিত। ধর্ম মঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে ধর্ম ঠাকুরের পূজা প্রচারের কথা আছে ঠিকই, তবে এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে বাঙালীর বীরত্ব ও যুদ্ধ বিগ্রহের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ।

ক. ধর্মমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের গঠন রীতি অনুযায়ী অভিশাপ কাহিনীর সূত্রপাত দিয়ে আরম্ভ। ধর্ম ঠাকুর মর্ত্যে পূজা প্রচার করতে চান। দেবসভার নর্তকী ছিলেন জাম্ববতী। নৃত্যের সময় তালভঙ্গ হওয়ায় শাপগ্রস্থ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন রমতি নগরে রেণুরায়ের কন্যারূপে। মর্ত্যে তাঁর নাম হলো রঞ্জাবতী। রঞ্জাবতীর এক বোন এবং ভাই ছিল। দিদি ছিলেন গৌড়ের রানী এবং দাদা মহামদ ছিলেন গৌড়ের মন্ত্রী।

সে সময় গৌড়েশ্বরের অধীনে অনেক সামন্ত রাজা থাকতেন। ঢেকুর গড়ের রাজা কর্ণসেনও গৌড় রাজের অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণসেন তাঁর ছয় পুত্রকে হারান। পুত্রহীন রাজা কর্ণসেনের সঙ্গে গৌড় রাজ তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ দেন এবং তাঁকে ময়নাগড়ের সামন্তরাজার দায়িত্ব দেন। রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ মহামদের পছন্দ হয় নি। তাই মনের ভাব চেপে রেখেই সে পরবর্তীকালে এদের সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য প্রস্তুত হলো। রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের মানত করে এমন কি 'শালে ভর দিতে' চাওয়ায় ধর্ম ঠাকুর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এক পুত্র সন্তান লাভের বর দেন। এই পুত্রের নাম লাউ সেন। লাউ সেনের জন্মের পর হতেই মাতুল মহামদ তাকে হত্যা করার চক্রান্ত করতে থাকে। পরে কৌশলে ইন্দা নামে এক অনুচর দ্বারা মহামদ শিশু লাউসেনকে হরণ করে। পুত্র হারিয়ে রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের কাছে পুত্র ফিরে পাওয়ার প্রার্থনা করে। ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীর কোলে কর্পূর ধবল নামে কর্পূরবিন্দু হতে এক পুত্র সৃষ্টি করে উপহার দেন। এবং পরে ধর্ম ঠাকুরের দয়ায় লাউসেনকে রঞ্জাবতী আবার ফিরে পায়। ধর্মঠাকুরের দয়ায় তিনি দুই পুত্রের জননী হলেন।

লাউসেন যুবা কাল থেকেই অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিতে থাকে। গৌড় রাজ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সামন্তরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। মাতুল মহামদ এতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই সময় লাউসেন কালুডোম ও তার স্ত্রী লখ্যার বন্ধুত্ব লাভ করে। লাউসেন কালুকে তাঁর প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু মহামদ লাউসেনকে ধ্বংস করার জন্য সচেষ্ট ছিল। রাজাকে বুদ্ধি দিয়ে লাউসেনকে কামরূপের রাজাকে দমন করতে পাঠালো। লাউ সেন ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদে কামরূপ রাজাকে দমন করে তার কন্যা কলিঙ্গাকে বিয়ে করে দেশে ফিরে এলো। চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় মহামদ আবার নূতন চক্রান্ত করে লাউসেনকে পাঠালো সিমুলের রাজা হরিপালের কন্যার সঙ্গে গৌড় রাজের বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে। সিমুল রাজ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় গৌড়রাজ লাউসেনকে নিয়ে সিমুলগড় আক্রমণ করেন। হরিপালের কন্যা কানাড়া ঘোষণা করলো যে বীর তার লৌহ গণ্ডার এক কোপে কাটতে পারবে তাকেই স্বামীত্বে বরণ করবে। গৌড়রাজ অসমর্থ হলে বীর লাউসেন এক কোপে লৌহগণ্ডারের মুন্ডচ্ছেদ করে কানাড়াকে বিয়ে করে। কানাড়া তার দাসী ধুমসীকে নিয়ে লাউসেনের সঙ্গে দেশে ফিরে।

চক্রান্তের পর চক্রান্ত। এবার মহামদ গৌড়রাজকে দিয়ে ইছাই ঘোষকে দমন করার জন্য লাউসেনকে পাঠায়। অজয় নদের তীরে উভয়ের যুদ্ধে ইছাই ঘোষ পরাজিত ও নিহত হয়। কোন দিক থেকে লাউসেনকে জব্দ করতে না পেরে এবারে মহামদ অন্যপথ ধরলো। গৌড়রাজকে দিয়ে আদেশ করালো লাউসেনকে পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাতে হবে। যদি লাউসেন ব্যর্থ হয় তবে তার মৃত্যুদন্ড হবে। ধর্মঠাকুরের আরাধনা করে লাউসেন পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখালো।

লাউসেন যখন ধর্মঠাকুরের তপস্যায় মগ্ন তখন মহামদ নিজেই ময়নাগড় আক্রমণ করে। যুদ্ধে লাউসেনের প্রথমা স্ত্রী কলিঙ্গা এবং কালুডোম স্ত্রীপুত্র সহ হত হয়। কিন্তু মহামদ কানাড়া এবং ধুমসীর কাছে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। লাউসেন দেশে ফিরে এসে বিধ্বস্ত নগরী ও প্রিয়জনের প্রাণহানি দেখে ধর্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানায়। ধর্মঠাকুরের দয়ায় আবার সকলের প্রাণ ফিরে পায়। এইভাবে মর্ত্যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচারিত হলো। লাউসেন পুত্র চিত্রসেনের উপর রাজ্যের ভার দিয়ে পত্নীসহ স্বর্গে ফিরে গেল।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে বাঙালী জাতির বীরত্বের কথাই মুখ্য। এ কাব্যের প্রধান আকর্ষণ নারীদের যুদ্ধ যাত্রা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই উদাহরণ বিরল দৃষ্টান্ত।

খ. ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবির নাম ময়ূরভট্ট। তাঁর কাব্যের নাম 'হাকন্দ পুরাণ'। কবি সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতকের লোক ছিলেন। বর্তমান পাঠ্যে আমাদের আলোচ্য এই কাব্যের দুই কবি রূপরাম চক্রবর্তী এবং ঘনরাম চক্রবর্তী। নিম্নে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

২. রূপরাম চক্রবর্তী

ধর্মমঙ্গল কাব্যের উল্লেখ যোগ্য কবি রূপরাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনী পাওয়া যায় তাঁর কাব্যে। তাঁর কাব্যের রচনা কাল নিয়ে গবেষক মহলে মতভেদ আছে। যাই হোক গবেষকগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মনে হয় সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি তিনি ধর্ম মঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন।

তিনি বর্ধমান জেলার কায়তি শ্রীরামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কবির কাব্যে আত্মপরিচয় অংশে কবি ব্যক্তিগত জীবনের লাঞ্ছনার কথা প্রকাশ করেছেন। অল্পবয়সে কবি পিতৃহীন হন। কবির লেখাপড়ায় মন ছিল না। সেজন্য তাঁর বড় ভাই তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। তাঁর বড় ভাই চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। বিতাড়িত হয়ে তিনি আর এক চতুষ্পাঠীতে আশ্রয় পান। কিন্তু সেখানেও পড়াশুনায় অমনোযোগী হওয়ায় গুরু কর্তৃক বিতাড়িত হন। বালক কবি নানা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিনপাত করেন। এই সময় এক সন্ধ্যায় তিনি একটি জলা জায়গার পাশে বসে ছিলেন। এমন সময় একটি বাঘ এসে বালক কবিকে আক্রমণ করে। তখন ধর্মঠাকুর ফকীরের বেশে তাঁর কাছে আবির্ভূত হন এবং তাকে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনার আদেশ দেন।

ধর্মঠাকুর অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদের দ্বারা পূজিত হতেন। ডোম, বাগদী প্রভৃতি জাতির লোকেরা এই দেবতার উপাসক ছিল। মনে হয়, সেই কারণে এই অন্ত্যজ শ্রেণীর দেবতা বিষয়ক কাব্য রচনা করার জন্য তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়েছিল। সমাজচ্যুত কবি নদীয়ার এক জমিদারের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। তাঁর কাব্যরচনা করার সময় বাংলার শাসক ছিল শাহ সুজা।

তাঁর কাব্যের ভাব ও ভাষা খুব সহজ এবং অলঙ্কার বর্জিত। মাঝে মাঝে অবশ্য সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য দেখা যায়। রূপরামের কাব্য খুব উৎকৃষ্ট না হলেও তাঁর সহজ বর্ণনাভঙ্গি পাঠক সাধারণকে বিশেষভাবে আনন্দ দান করে। নিম্নে তাঁর কাব্য হতে উদ্ধৃতি দেওয়া হলো :

কপালে সিঁদুর পরে তপন-উদয়।
চন্দ্র চন্দ্রিমা তার কাছে রয়॥
চন্দ্র-কোলে শোভা যেন করে তারাগণ।
ঈষৎ করিয়া দিল বিন্দু বিচক্ষণ॥

অথবা, কবি যেখানে লাউসেনের ব্যক্তি চরিত্র প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন :

শিশুকাল হৈতে আমি ধর্মের তপস্বী।
শুক্রবার দিন মোর ধর্ম একাদশী॥
শনিবারে পারণাতে ভক্ষ্য ভোজ্য খাই।
ধর্মের সেবক হয়্যা সুখ নাহি চাই॥

২. ঘনরাম চক্রবর্তী

ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি অষ্টাদশ শতকে তাঁর কাব্য রচনা করেন। কবি তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। আত্মপরিচয় অংশ হতে জানা যায় কবির বসতি ছিল বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম গৌরীকান্ত এবং মাতার নাম ছিল সীতা দেবী। তাঁর মাতামহের নাম ধনঞ্জয়। কবি চার পুত্রের জনক ছিলেন। ছেলেদের নাম যথাক্রমে রামরাম, রামগোপাল, রাম গোবিন্দ এবং রামকৃষ্ণ। কবি নিজে তাঁর পিতার মত রামভক্ত ছিলেন। কাব্যের ভণিতায় কবি নিজেকে "কৌশল্যানন্দন কৃপাবান্" বলে উল্লেখ করেছেন।

ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে-বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। মনে হয় তিনি বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের প্রেরণায় এই কাব্যটি রচনা করেছিলেন।

ঘনরামের কাব্যটি মোট চব্বিশ সর্গে বিভক্ত। প্রথম সর্গে দেবদেবীর বর্ণনা আছে। অন্যান্য সর্গগুলি যথাক্রমে ঢেকুর পালা, রঞ্জাবতীর বিবাহ, হরিশ্চন্দ্র পালা, লাউসেনের জন্মপালা, আখরা পালা, কলানির্মাণ পালা, গৌড় যাত্রা পালা, কামদল বধ পালা, জামতি পালা, গোলাহাট পালা, হস্তিবধ পালা, বাঙুর যাত্রা পালা, কামরূপ যুদ্ধপালা, কানাড়ার স্বয়ম্বর পালা, কানাড়ার বিবাহ পালা, মায়ামুণ্ড পালা, ইছাই বধ পালা, বাদল পালা, পশ্চিম উদর আরম্ভ পালা, জাগরণ পালা, পশ্চিম উদয় পালা ও স্বর্গারোহণ পালা ইত্যাদি।

ডঃ সুকুমার সেন ঘনরামের কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যখ্যাতির মূলে রয়েছে 'মুদ্রণ সৌভাগ্য'। তাছাড়া তাঁর কাব্যের অন্যগুণ হচ্ছে "স্বচ্ছন্দতা ও গ্রাম্যতাহীনতা।" ঘনরাম সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন—এ ছাড়া তাঁর নানা শাস্ত্রে দখল ছিল।

ঘনরাম তাঁর কাব্যে সে যুগের অনেক সামাজিক রীতিনীতির কথা উল্লেখ করেছেন। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ মার্জিত ভাব দেখিয়েছেন। কাব্যের মধ্যে একটি পরিশীলিত ভাব বজায় রয়েছে। তাঁর রসবোধ কোথাও সীমা লঙ্ঘন করেনি।

যুদ্ধবর্ণনায় কবির কৃতিত্ব সর্বাধিক। ধর্মমঙ্গল কাব্যের বহু ক্ষেত্রে এই যুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে।

ভূতলে আছাড়ে ভুজ সারি মালসাট।
সাজে শত্রু-সমরে সাক্ষাৎ যমরাট॥
বিরাট সমরে যেন সুশর্মার রণ।
সাজিল রাবণ কিবা বধিতে লক্ষণ॥

অথবা,

হাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে টাঙ্গি শেল রাখে
ঝপ্ ঝপ্ রাখিছে তীর।
কোটালের ঠাঁট জুড়ে এক কাট,
সমরে না রহে স্থির ॥

ধর্মমঙ্গল কাব্যে নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেরাই অংশ গ্রহণ করেছে—এবং পুরুষকে যুদ্ধের প্রেরণা ও দিয়েছে। ঘনরামের কাব্যে কালু যখন ঘুষ খেয়ে যুদ্ধে যেতে নারাজ হয়েছিল তখন তার স্ত্রী লখ্যা তাকে যুদ্ধের প্রেরণা দেওয়ার সময় যেভাবে তার কাছে আবেদন নিবেদন জানিয়েছে তা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হলো—

কান্দিয়া পড়িল লখা কালুর চরণে।
উঠহে পরাণ নাথ কি আর জীবনে ॥
কি কাল তোমার ঘুম সর্বনাশ হল্য।
শাকা শুকা তের ডোম রণে যুঝে মল্য ॥
কি লয়ে সংসার আর কার মুখ চাও।
সকলি মজিল নাথ রণে সেজে যাও ॥

ঘনরাম মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু পৌরাণিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন অকৃত্রিমভাবে। আর একটি জিনিস যা তাঁর কাব্যে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষের নিষ্ঠা ও স্বদেশ প্রীতির পরিচয়। নিম্নশ্রেণীর নারীরাও যে যুদ্ধবিগ্রহে যোগ দিতো এবং দেশের গৌরব বজায় রাখতে সক্ষম তার পরিচয় ঘনরামের কাব্যে নারীচরিত্রগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। এই সব কারণে ধর্মমঙ্গল কাব্যকে রাঢ় জীবনের মহাকাব্য বলা হয়।

একাদশ অধ্যায়

মহাভারত অনুবাদ
কাশীরাম দাসের মহাভারত

ভূমিকা

'মহাভারতের কথা অমৃত-সমান,
হে কাশী, কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।'

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

অনুবাদ কাব্যের ক্ষেত্রে রামায়ণ এবং ভাগবতের অনুবাদের অনেক পরে মহাভারতের অনুবাদ হয়েছে। এর কারণ, রামায়ণ কাব্যের কাহিনীর মধ্যে লোক-জীবনের উপাদান ও পারিবারিক প্রসঙ্গ বেশী থাকায় সে যুগে এই কাব্যের অনুবাদের জনপ্রিয়তা খুবই বেড়ে গেছল। ভাগবতের কাহিনীর মধ্যেও লোক জীবনের প্রতিফলন বেশি ছিল। ফলে, এই দুই কাব্যে রাজ-জীবন বৃত্ত অপেক্ষা লোক জীবন কথা বেশী থাকায় চৈতন্যপূর্ব অভিজাত সংস্কৃতি এবং লোক সংস্কৃতির সমন্বয়ের মাধ্যম হিসেবে অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হয়েছিল এবং জনসাধারণের মধ্যে কাব্য দুটির প্রচার ও প্রসার সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে মহাভারতের কাহিনীর মধ্যে লোক জীবনের স্পর্শ খুবই কম বরং তুলনামূলকভাবে দেখা যায় এই কাব্যের আসল বক্তব্যই হচ্ছে আর্য বীর্যগাথা এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রস্তুতি ক্ষেত্রে চরিত্রগুলির অগ্রগতি। মনে হয়, এই কারণেই মহাভারতের অনুবাদের কাজ অনেক পরে হয়েছে।

বাংলা মহাভারতের প্রথম অনুবাদক হিসেবে কবি সঞ্জয়ের কৃতিত্ব আজও বিতর্কিত। তাই সঞ্জয়কে বাদ দিলে দেখা যায় বাংলা মহাভারতের অনুবাদ সম্ভব হয়েছিল একজন মুসলমান রাজপুরুষের প্রেরণার ফলে। তখন বাংলার সিংহাসনে আসীন ছিলেন সুলতান হুসেন শাহ। চট্টগ্রাম অঞ্চলের শাসক ছিলেন তাঁর এক সেনাপতি। তাঁর নাম ছিল পরাগল খাঁ। শোনা যায়, পরাগল খাঁ মহাভারতের গল্প শুনতে খুবই ভালবাসতেন। সে কারণে তিনি পরমেশ্বর দাসকে বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তাঁকে কবীন্দ্র উপাধিতেও ভূষিত করেন। পরাগল খাঁর বাংলা ভাষা তথা মহাভারতের উপর কতখানি আকর্ষণ ছিল তা হয়ত আজ বলা কষ্টকর। তবে মনে হয়, বাঙালী হিন্দুর মন হতে বিদেশী শাসকের ভীতি দূর করার জন্য অথবা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়ের সেতু রচনা করার জন্য অথবা মুসল শাসক মনের উদারতা দেখাবার জন্য এই মহাভারত প্রীতি। এছাড়া আরও একটি কারণে পরাগল খাঁ মহাভারতের

কাহিনীর উপর আকৃষ্ট হতে পারেন। সেটি হচ্ছে মহাভারত কাব্যের যুদ্ধবিগ্রহ পর্ব। যাইহোক আমরা পরাগল খাঁর সাংস্কৃতিক চেতনার ফল স্বরূপ বাংলা মহাভারতের অনুবাদ হাতে পাচ্ছি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মাধ্যমে। পরমেশ্বরের মহাভারতের নাম ছিল 'পান্ডব বিজয়'। তিনি সমগ্র মহাভারতেয় অনুবাদ করে যান নি। পরমেশ্বর তাঁর অনুবাদ কাব্যে পরাগল খাঁর খুবই প্রশংসা করে গেছেন।

ব্যাসদেবের মহাভারতের পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষায় জৈমিনির মহাভারতও বিশেষ প্রচলিত ছিল। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ পরমেশ্বরের কাব্যের সংক্ষিপ্ত রূপে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি পরবর্তী কবি শ্রীকর নন্দীকে জৈমিনির মহাভারতের 'অশ্বমেধ পর্ব" অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন। ছুটি খাঁর ভাল নাম ছিল নসরৎ খাঁ। শ্রীকর নন্দীও তাঁর কাব্যে ছুটি খাঁর সুখ্যাতি করেছেন।

দেখা যাচ্ছে গৌড়রাজ হুসেন শাহের জীবদ্দশায় বাংলা মহাভারতের অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছিল তাঁরই দুই সেনাপতির পৃষ্ঠ পোষকতায়। সে দিক থেকে বাংলা মহাভারতের অনুবাদের ক্ষেত্রে মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে হয়ত এই কাব্যের অনুবাদ আরও পরে হত। পরমেশ্বরের ও শ্রীকরনন্দীর অব্যাহতি পরে অথবা সমসাময়িক কালে আর যাঁরা মহাভারতের অনুবাদ করেছেন তাঁদের মধ্যে কাশীরাম দাস উল্লেখযোগ্য।

কাশীরাম দাস

কাশীরাম দাস সপ্তদশ শতকের মহাভারতের বাংলা অনুবাদকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ভারত কথাকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাঙালীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কৃত্তিবাস যেমন রামায়ণ অনুবাদ করে বাঙালীর হৃদয়-আসনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাশীরাম দাসও অনুরূপভাবে মহাভারতের রাজ-কাহিনীকে বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। কৃত্তিবাসের মত কাশীরাম দাসও বাঙালীর কাছে সমান জনপ্রিয় কবি।

কাশীরাম দাস তাঁর কাব্যে নিম্নরূপ আত্মপরিচয় দিয়েছেন—

'ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গীগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত, কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণ দাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
আমি হ'ব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥'

আত্মপরিচয় হতে জানা যায়—কবির বাস ছিল বর্ধমান জেলার উত্তরে ইন্দ্রাণী (কাটোয়া) পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গী অথবা সিন্নি গ্রামে। তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। কমলাকান্তের তিন পুত্র—কৃষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর। এঁরা

সকলেই কবিত্বগুণ সম্পন্ন ছিলেন। কৃষ্ণদাস পরবর্তীকালে কৃষ্ণবিলাস কাব্য রচনা করেন। গদাধর জগন্নাথমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কমলাকান্ত নীলাচলে বাস করতেন। মনে হয় কাশীরাম দাসও নীলাচলে শেষ জীবনে বসবাস করতেন।

কাশীরাম দাস মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব সম্পূর্ণ অনুবাদ করে যেতে পারেননি। অনেকের মতে তিনি মহাভারতের মাত্র সাড়ে তিনপর্ব অনুবাদ করেছিলেন। তারপর তাঁর মৃত্যু ঘটে। অবশিষ্ট পর্বের অনুবাদ করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম। নন্দরাম নিজেই উল্লেখ করেছেন—

"নন্দরাম দাস বলে শুন শ্যাম রায়।
আমারে অভয় প্রভু দেহ-জম-দায়॥
জ্যেষ্ঠতাত কাশীদাস পরলোক কালে।
আমারে ডাকিয়া বলিলেন করি কোলে॥
শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন।
ভারত অমৃত তুমি করহ রচন॥"

কাশীরামদাস সপ্তদশ শতকের আরম্ভেই কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁরা সকলেই বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি মহাভারতের হুবহু অনুবাদ করে নি। অনেক স্থানে তিনি স্বাধীনভাবে ঘটনা সংযোজন করেছেন। আবার অনেক প্রক্ষেপ অংশ তাঁর কাব্যকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। এ পর্যন্ত কাশীরাম দাসের মহাভারতের একটিও সঠিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি।

কাশীরাম দাস বিশেষ কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মহাভারত কাব্য নানা রসের এবং নানা ভাব ও চরিত্রের একটি সম্মিলিত রূপ। কাশীরাম দাস তাঁর কাব্যের অনুবাদে এই নানা রস, ভাব ও চরিত্র চিত্রণের দিকটি উল্লেখযোগ্য ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর কাব্যের ভাষা সুললিত এবং রুচিসম্মত। শব্দের ব্যবহারে কবির কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। সমগ্র কাব্যটি পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত। এবং আগাগোড়াই ভাষার প্রাঞ্জলতা বজায় রেখে তিনি কাব্যটিকে সুখপাঠ্য করে তুলেছেন। তাঁর কাব্য হতে অল্পবিস্তর উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হলো—

১. ভীমের বীরত্ব বর্ণনা ঃ

"মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে।
দানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে॥
দণ্ড হাতে যম যেন বজ্র হাতে ইন্দ্র।
খেদাড়িয়া লৈয়া যায় সব নৃপবৃন্দ॥"

২. অর্জুনের স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিতির বর্ণনা ঃ

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপাম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কতশুচি করিয়াছে শোভা॥"

৩. যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা ঃ

একপদ কাটা কারো কাটা দুই ভুজ।
বুকের প্রহারে কেহ হইয়াছে কুঁজ॥
আড়ে ওড়ে ঝাড়ে ঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া।
জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতারিয়া॥
ক্ষাত্র দেখি ব্রাহ্মণ পালায় উৎরড়ে।
দ্বিজ দেখি ক্ষাত্রিয় লুকায় ঝাড়ে ঝোড়ে॥

কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদের প্রধান কৃতিত্ব মহাভারত কাহিনীর অনুবাদের মধ্যে বাঙালীয়ানার প্রতিষ্ঠা। ভারতের রাজ-কাহিনীর মহাকাব্যটিকে অনুবাদের সময় বাংলাদেশের সরস মাটির উপযোগী করি তিনি পাঠক সমাজকে উপহার দিয়েছেন। কাশীরাম দাস চৈতন্যোত্তর যুগের কবি ছিলেন এবং তিনি নিজেও বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন। তাই তাঁর কাব্যে বীর কৃষ্ণ "শ্যামনীলোৎপল আভায়" অনেক কোমল ভাবে চিত্রিত হয়েছেন। সর্বোপরি মহাভারতের নারী চরিত্রগুলির চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে বাঙালী নারীর গুণ ও প্রকৃতি আরোপ করেছেন। বাঙালী নারীর সপত্নী ঈর্ষা, পতিসেবা ইত্যাদি বিষয় তিনি তাঁর কাব্যে চিত্রিত করেছেন। দ্রৌপদী ক্ষাত্রিয় মহিমা হারিয়ে এ কাব্যে তিনি বাঙালী বধূ হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন।

কাশীরাম দাস কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে স্বাধীন চিন্তার আশ্রয় নিয়েছেন তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন শ্রীবৎস চিন্তা, সুভদ্রা হরণ, সত্যভামার তুলাব্রত ইত্যাদি কাহিনীর সংযোজন তাঁর নিজস্ব এবং এর মধ্যে বাঙালীয়ানারই পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে, কাব্যটির মূল ভাষা আজ আর রক্ষিত নেই। নানা হাতের স্পর্শে কাব্যটির মূল ভাষা হারিয়ে গেছে। তবুও কাশীরাম দাসের মহাভারত কাব্য আজও বাঙালীর হৃদয়ে অক্ষয় হয়ে আছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত এত জনপ্রিয় না হলেও মহাভারতও বাঙালী-জীবনের মহাকাব্য হয়ে উঠেছে। কারণ জীবনের নানা পথ সন্ধানের বাণীরূপ এমন আর কোন কাব্যের মধ্যে প্রকাশ পায়নি। তাই আজও জনসাধারণের কাছে—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান॥

দ্বাদশ অধ্যায়	আরাকান রাজসভার প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা ঃ দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল

ক. লোক সাহিত্যের উদ্ভব

তুর্কী আক্রমনোত্তর বাংলা দেশে নব উদ্ভূত লোকসংহতি সে যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই লোক সংহতির ধারক ছিল বাংলা দেশের গ্রামগুলি। ফলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য গ্রাম কেন্দ্রিক ছিল একথা বলা অন্যায় হবে না। কারণ গ্রামই ছিল সাধারণ মানুষের আবাস স্থল। সাধারণ মানুষদের সঙ্গে অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা সাংস্কৃতিক বিনিময়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটেছিল। চৈতন্যদেবের প্রভাব সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় তথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল তা চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরই ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। তবে সব কিছুই হারায় না তার কিছু না কিছু রেশ থেকে যায়। চৈতন্য পরবর্তী যুগের শাক্ত প্রভাব, তার আরও পরে বিদেশী বণিকদের প্রভাব জাতীয় জীবনকে ধীরে ধীরে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। মুসলমান শাসনের শেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ জীবনে নানা বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। আলিবর্দী সে ভাঙন রোধের চেষ্টা করে সাময়িক সাফল্য লাভ করলেও তার স্থায়ীত্ব যে ক্ষণস্থায়ী ছিল তার সাক্ষী ইতিহাস।

ঠিক এমনি পরিস্থিতির মধ্যে গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থায় ভাঙন ধরেছিল। গ্রাম্য জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এতদিন যে সাহিত্য রচিত হয়ে আসছিল তা নানাভাবে ব্যাহত হতে লাগল। জমিদাররা ব্যক্তিগত সুখ সমৃদ্ধির দিকে সজাগ হয়ে উঠল। সংহত বাঙালী সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। এই দ্বিধা বিভক্ত বাঙালী সমাজের একদিকে শহর কেন্দ্রিক অভিজাত সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে ক্ষীয়মান গ্রাম্য লোক জীবন। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি হতে এই দুই সম্প্রদায়ের সাহিত্য নূতন এবং পৃথকভাবে রচিত হতে থাকে। সহর-কেন্দ্রিক অভিজাত সম্প্রদায় পুরাণাশ্রয়ী কাহিনী কাব্য রচনায় ব্রতী হন এবং অন্যদিকে ক্ষীয়মান গ্রাম্য লোকজীবন হতে সৃষ্টি হলো বাউল, দেহ সর্বস্ব সহজিয়া, মুর্শিদা, মারফতী, কবিগান, জারি, শারিগান ইত্যাদি লোকসংগীত। বাংলার এই লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না। তবুও এ সময় কিছু প্রণয়মূলক গাথা সাহিত্য মুসলমান কবিগণ আরবী-ফারসী লোককথা হতে বাংলা ভাষায় আমদানি করেছিলেন।

বাংলা দেশের প্রত্যন্ত সীমায় চট্টগ্রাম এবং তার পূর্বে আরাকান রাজ্য। এ রাজ্যের রাজধানী ছিল রোসাঙ্গ। আরাকান মগদের দেশ হলেও বঙ্গসংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল। হিন্দু মুসলমান, মগ, বৌদ্ধ প্রভৃতি জাতির মিলিত বাসভূমি ছিল আরাকান। সপ্তদশ শতাব্দীতে রোসাঙ্গে চৈতন্য প্রভাবমুক্ত একটি মানবতাভিমুখী কাব্য সাহিত্য গড়ে উঠে। রাজা সুধর্মার উদার ধর্মীয় মনোভাব এবং তাঁর মন্ত্রী আসরফখাঁর সাহিত্য প্রীতি এই লৌকিক আখ্যান কাব্য রচনার বিশেষ ভিত্তিভূমি। চট্টগ্রামের পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ (নসরৎ খাঁ) বাংলা মহাভারত রচনার ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে এই ভিত্তিভূমিকে সুদৃঢ় করে রেখেছিল। ফলে, লোক কাব্যের ধারা শুধুমাত্র বাংলা দেশের গ্রাম জীবনেকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত হয়েছিল তা নয়; প্রায় একই সময়ে আরাকানের রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় রোসাঙ্গে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

রোসাঙ্গের রাজ দরবারের দুই কবি দৌলক কাজী এবং সৈয়দ আলাওল বাংলা ভাষায় লৌকিক প্রণয়গীতি রচনা করে যুগসন্ধিক্ষণের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নব অধ্যায় সূচনা করেছেন।

খ. আরাকানের দুই মুসলমান কবি

১. দৌলত কাজী

দৌলত কাজী রোসাঙ্গের রাজা সুধর্মার সেনাপতি আসরফ খানের নির্দেশে সতীময়নামতী বা 'লোর-চন্দ্রানী' কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি মূলে গ্রাম্য হিন্দী ভাষায় রচিত ছিল। আশরফ খান লোর-চন্দ্রানীর কাহিনী পড়ে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন—তাই তিনি দৌলত কাজীকে বাংলা ভাষায় এই কাব্যটি রচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। কবি কাব্য সমাপ্ত করার পূর্বেই দেহত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে কবি আলাওল এই কাব্যটি সমাপ্ত করেন।

কাব্যের শুরুতে দৌলত কাজী তাঁর পৃষ্ঠপোষক আসরফ খানের খুবই প্রশংসা করেছেন। কবি বলেছেন—

"শ্রীযুক্ত আশরাফ খান পণ্ডিত প্রধান।
ষোলকলা পূর্ণ যেন চন্দ্রিকা সমান॥
নীতি বিদ্যা কাব্যশাস্ত্র নানা রসময়।
পঠিতে শুনিতে নিত্য আনন্দ হৃদয়॥"

কিন্তু, আশরাফ খান দৌলত কাজীর আগেই লোকান্তরিত হন। ফলে তিনি হয়ত এ কাব্যের সামান্যই দেখে যেতে পেরেছিলেন। দৌলক কাজী বিদ্বান ও মার্জিত রুচির কবি ছিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। কাব্যের মধ্যে অলঙ্কারের পরিমিত প্রয়োগ তাঁর কাব্যের একটি বিশেষ গুণ। কবির ছন্দ-জ্ঞান

ছিল অসাধারণ। শব্দ চয়ন ব্যাপারে কবি খুবই সচেতন ছিলেন। তাঁর কাব্য হতে সামান্য উদ্ধৃতি দিলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে—

"শাঙন গগর সঘন ঝরে নীর
তবু মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর।
মদন আসিক জিনি বিজুরীর রেহা
থরকএ যামিনী কমপায় মোর দেহা।"

আগেই বলা হয়েছে যে 'লোর চন্দ্রানীর' কাহিনী গ্রাম্য হিন্দীতে লেখা। এ কাব্যের কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

'গোহারী' দেশের রাজা লোরের সঙ্গে সুন্দরী ময়নামতীর বিয়ে হয়। তাদের বিবাহিত জীবন খুবই সুখে কাটছিল। এমন সময় এক যোগী মোহরা দেশের রাজকন্যা 'চন্দ্রানী'র একটি ছবি গোপনে লোরকে দেখায়। চন্দ্রানী বিবাহিতা কিন্তু তার স্বামী ছিল বামন এবং অপদার্থ। লোর চন্দ্রানীর রূপে মুগ্ধ হয়ে মোহরা দেশে গিয়ে চন্দ্রানীর সঙ্গে পরিচিত হয়। গোপনে তারা যখন দেশ ত্যাগ করে পলায়ন করছিল তখন চন্দ্রানীর স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং লোর ও চন্দ্রানীর স্বামীর মধ্যে বনপথে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে চন্দ্রানীর স্বামী নিহত হন। লোর এবং চন্দ্রানী পরম সুখে মোহরা দেশে সন্তান সন্ততি নিয়ে বাস করতে থাকেন। লোরের আর ময়নামতীর কথা মনে পড়ে না।

এদিকে ময়নামতী নানা প্রলোভনের মধ্যে ও নিজের সতীত্ব রক্ষা করে লোরের অপেক্ষায় দিন কাটাতে লাগলেন। অবশেষে ময়নামতী এক ব্রাহ্মণের হাতে তাঁদের পোষা শুক পাখী লোরের কাছে পাঠালেন। লোর শুকপাখী দেখে ময়নামতীর কথা মনে পড়লো। চন্দ্রানীর পুত্রের হাতে মোহরার রাজ্যভার দিয়ে চন্দ্রানীসহ লোর ফিরে এলো ময়নামতীর কাছে। এখানেই কাহিনী শেষ হয়েছে।

'লোর চন্দ্রানীর' কাহিনীর মাধ্যমে লোক জীবনের উচ্ছৃংখল প্রণয় এবং সতীত্বের আদর্শের কথা বলা হয়েছে। দৌলৎ কাজী অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে এই রোমান্টিক লৌকিক প্রণয় গাথা বাংলা ভাষায় পরিবেশন করেছেন।

২. সৈয়দ আলাওল

রোসাঙ্গের রাজ দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় যে বাংলা সাহিত্য চর্চা আরম্ভ হয়েছিল কবি সৈয়দ আলাওলের ভূমিকা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি ইসলামী বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এবং অগ্রগণ্য কবি। তাঁর কবি প্রতিভার সমুজ্জ্বল প্রভায় বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় দীপ্ত হয়ে আছে। কাব্য মধ্যে তিনি যে আত্ম পরিচয় দিয়েছেন তা খুবই চিত্তাকর্ষক এবং চমকপ্রদ।

'মুল্লুক ফতেহাবাদের' অন্তর্গত 'জালালপুর' গ্রামে কবির জন্ম হয়। ফতেয়াবাদ বর্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ছিল বলে অনুমান করা হয়। কবির পিতা নবাব

কুতুবের সভাসদ ছিলেন। নৌকা যোগে আলাওল তাঁর পিতার সঙ্গে অন্যত্র কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে পোর্তুগীজ জলদস্যুর আক্রমণে কবির পিতার প্রাণনাশ হয় এবং কবিকে তারা বেঁধে নিয়ে যায়। আলাওল কোন ক্রমে মুক্ত হয়ে আরাকানে গিয়ে ঘোড় সওয়ারের চাকরী গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তাঁর কবি প্রতিভার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। তখন রোসাঙ্গের রাজ অমাত্য মাগন ঠাকুর তাঁকে আশ্রয় দেন এবং তাঁরই অনুরোধ ক্রমে তিনি 'পদ্মাবতী কাব্য' রচনা করেন ; মাগন ঠাকুরের আশ্রয়ে থেকেই কবি তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'সয়ফুল মুলুক বদি উজ্জমাল' কাব্য রচনায় হাত দেন।

মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পর কবি রোসাঙ্গের রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার শ্রেষ্ঠ অমাত্য সুলেমানের আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁর অনুরোধে দৌলৎ কাজীর অসমাপ্ত কাব্য লোর-চন্দ্রানী বা সতী ময়নামতী সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি প্রধান সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদের অনুরোধে 'হপ্ত পয়কর' রচনা করেন।

এই সময় কবির জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। ঔরঙ্গজীবের ভয়ে শাহসুজা রোসাঙ্গের রাজ দরবারে আশ্রয় লাভ করেন। কবির সঙ্গে শাহসুজার হৃদ্যতা জন্মে। মৃজা নামক কোন চক্রান্তকারী ব্যক্তির মিথ্যা অনুযোগে রোসাঙ্গের রাজা তাঁকে কারারুদ্ধ করেন এবং শাহ সুজাকে সপরিবারে নানাভাবে বিড়ম্বিত করেন। পরে অবশ্য রোসাঙ্গ রাজ ভুল বুঝতে পেরে কবিকে মুক্তি দেন এবং মৃজাকে শূলে চড়ান।

এরপর কবি সৈয়দ মামুদ শাহের আশ্রয় লাভ করেন এবং 'সয়ফুল মুলুক' কাব্যটি সমাপ্ত করেন এবং রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্মার অনুরোধে কবি 'দারা সেকেন্দার নামা' রচনা করেন।

আলাওল কিছু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদও রচনা করেছিলেন। তবে এইসব পদের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায় না—এগুলিকে লৌকিক পর্যায়ের বৈষ্ণব ভাবাপন্ন কবিতা বলাই যুক্তিযুক্ত।

আলাওলের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'পদ্মাবতী' কাব্য। 'পদ্মাবতী' কবির মৌলিক রচনা নয়। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বিখ্যাত সুফী সাধক মালিক মহম্মদ জায়েসী হিন্দী ভাষায় 'পদুমাবৎ' নামে একটি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের কাহিনী সম্রাট আলাউদ্দীন কর্তৃক পদ্মিনী লাভের কাহিনী। কিন্তু জায়েসীর কাহিনীতে পদ্মিনীর স্বামীর নাম ভীমসেনের পরিবর্তে রত্নসেনের নামের উল্লেখ আছে। জায়েসীর কাব্যের সুফী ধর্মের প্রভাব খুবই। কিন্তু আলাওল জায়েসীর কাব্যের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন নি। কবি কাব্যের মধ্যে কিছু নূতন বিষয় সংযোজন করেছেন। কবি বলেছেন—

'স্থানে স্থানে প্রকাশিব নিজমন উক্তি'।

অনুবাদের সময় কবি সুফী ধর্মের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করেন নি। কাব্যের

মানবিক দিক বজায় রেখেছেন। কবি কেবলমাত্র আরবী ও ফরাসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন না—তিনি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। হিন্দু শাস্ত্র এবং পুরাণ সম্বন্ধে কবির জ্ঞান ছিল যথেষ্ট। সে জন্যে তাঁর কাব্যে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় রূপটি ফুটে উঠেছে। মুসলমান এবং হিন্দু লোকাচার ও সামাজিক আচার-আচরণের খুঁটিনাটি চিত্রও তাঁর কাব্যে ঠাঁই পেয়েছে। আলাওলের কাব্যে জায়েসীর ভাবধারার সঙ্গে সংগে তিনি নির্ভেজাল বাঙালিয়ানা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যার ফলে আলাওল রচিত চরিত্রগুলি বাঙালী সুলভ রস মাধুর্যে অভিষিক্ত হয়ে উঠেছে। কবির সুফী ধর্ম নিষিক্ত প্রেমানুভূতির স্বরূপ উদ্ধৃত করা হল ঃ—

'প্রেম মূল ত্রিভুবন যত চরাচর।
প্রেম তুল্য বস্তু নাই পৃথিবীর ভিতর॥'

সৈয়দ আলাওলের কাব্যের কাহিনী নিম্নরূপ ঃ—

চিতোরের রাণা রত্নসেনের সংগে রাজকন্যা নাগমতীর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু, রত্নসেন সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীর রূপের খ্যাতি শুনে ছদ্মবেশে সিংহল গিয়ে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করেন। পরস্পরের রূপে উভয়ে মুগ্ধ হন। কিন্তু রত্নসেনের এই গোপন সাক্ষাৎকারের সময় তিনি ধরা পড়েন এবং কারারুদ্ধ হন। তারপর দৈব বলে তিনি মুক্তি লাভ করে নিজ পরিচয় দিয়ে পদ্মাবতীকে বিয়ে করে চিতোরে নিয়ে আসেন। পদ্মাবতীর সৌন্দের্যের সংবাদ পেয়ে আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করেন এবং রত্নসেনকে বন্দী করেন। চিতোরের দুই বীর যোদ্ধা বাদল ও গোরা বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করে রত্নসেনকে উদ্ধার করেন। কিন্তু রত্নসেনের বিপদ অন্যদিক থেকে আসে। তাঁর পার্শ্ববর্তী রাজা পদ্মাবতীকে হরণ করার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে পার্শ্ববর্তী রাজা নিহত হন; রত্নসেনও যথেষ্ট আহত হন এবং পরে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর চিতায় নাগমতী ও পদ্মিনী সহমৃতা হন। এখানেই কাহিনীর সমাপ্তি।

জায়েসীর এই কাহিনীকে আলাওল সম্পূর্ণ বাঙালী জীবন পরিবেশের মধ্যে কাব্যে রূপায়িত করেছেন। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুফী ধর্মের আবরণ মুক্ত করে সম্পূর্ণ মানবিক দিকটি উদ্ঘাটিত করেছেন। তাঁর কাব্যের প্রাণ ধর্মের দিকটি এখানেই। এবং এই কারণে তিনি ইসলামী বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি।

ত্রয়োদশ অধ্যায় | ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল

ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের শেষ মঙ্গল কাব্যের কবি। বর্ধমান জেলার ভুরসুট পরগণার অন্তর্গত পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। কবির জন্ম সাল আনুমানিক ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ। কবির পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন। কবির ছোটবেলায় মাতুলালয়ে মানুষ হন—কারণ বর্ধমান রাজের সঙ্গে বিবাদের ফলে তাঁর পিতা যথাসর্বস্ব হারান। মাতুলালয়ে তিনি সংস্কৃত টোলে শিক্ষালাভ করেন। কবি মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে গুরুজনদের অজ্ঞাতে বিবাহ করেন। পরে গুরুজনদের ভর্ৎসনার ফলে গৃহত্যাগ করে দেবানন্দপুর গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয় লাভ করেন এবং সেখানে ফরাসী শিক্ষা লাভ করেন। ফরাসী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে কবি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ভারতচন্দ্রের কপালে নিরবচ্ছিন্ন গৃহ সুখ ছিল না। বর্ধমান রাজের সঙ্গে বৈষয়িক গোলমালের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন। তারপর তিনি কৌশলে কারাগার হতে মুক্তিলাভ করে কটকে পলায়ন করেন। কটক থেকে তিনি পুরীতে কিছুদিন শঙ্কর আশ্রমে সন্ন্যাসজীবন যাপন করেন। এখান হতে সন্ন্যাসীবেশে ভারতচন্দ্র বৃন্দাবন যাত্রা করেন। পথে তাঁর আত্মীয়ের হাতে ধরা পড়ে গৃহে কিছুদিন তাঁর স্ত্রী সঙ্গে বসবাস করেন। এরপর স্ত্রীকে আত্মীয়বাড়ী রেখে তিনি ফরাসডাঙায় যান এবং সেখানে ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হন। এবং তাঁর সহায়তায় পরে তিনি মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি নিযুক্ত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি প্রথমে 'রসমঞ্জরী' নামে একটি কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। এর পরেই তিনি তাঁর বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। দেবানন্দপুরে থাকাকালীন তিনি ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দে দু'খানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন। এছাড়া ভারতচন্দ্র আরও কিছু ভিন্ন বিষয়ক পদ-সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে কবি পরলোক গমন করেন।

ভারতচন্দ্র প্রতিভাবান কবি ছিলেন। তাঁর প্রতিভার সামগ্রিক স্ফুরণ ঘটেছিল অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা ক্ষেত্রে। অন্নদামঙ্গল কাব্যটি মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত ধারায় লিখিত হলেও এখানে দেবী কালিকার মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিদ্ধ ভূমিকা নেই। কারণ অনেকে দেবী কালিকাকে 'বিশেষ পারিভাষিক অর্থে মঙ্গল দেবী নন' বলে উল্লেখ করেছেন। "কালিকা মঙ্গল" বা "বিদ্যাসুন্দর কাব্য" বিশেষ ভাবে বিদ্যা ও সুন্দরের রোমাণ্টিক লোক জীবনাশ্রয়ী প্রেম চাতুর্য গাথা। কেবলমাত্র বাংলাদেশেই এই অবিমিশ্র মানবিক প্রেম কাহিনী দেবী কালিকার কৃপার আবরণে অন্তরালবর্তী হয়ে

প্রকাশিত হয়েছে।" আগেই বলা হয়েছে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ ঐতিহ্য। মানবতাবাদ চিন্তাভাবনার ফলে দেববাদ নির্ভরতার দিকটি প্রায় চাপা পড়ে আসছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিককার সামাজিক এবং ধর্মীয় পরিমণ্ডলও পরিবর্তিত হচ্ছিল। দেশের রাজনৈতিক আবর্ত সহসা ভিন্ন পথে বাঁক নেওয়ার প্রয়াসী। ঠিক এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে ভারতচন্দ্র নিছক দেববাদ নির্ভর মঙ্গল কাব্য রচনায় ব্রতী হতে পারেন নি। তাছাড়া তাঁর বিদগ্ধ কাব্য চেতনা রাজ আশ্রয়ী বলেই প্রাচীন মঙ্গলকাব্যের বাতাবরণে কবি প্রতিভাকে প্রবাহিত করে দিলেও আঙ্গিক গঠনের দিকে যুগোপযোগী অভিনবত্ব বেছে নিয়েছেন। এই কারণেই ভারতচন্দ্রের মঙ্গলকাব্যকে গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের আওতায় আনা যায় না।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের রচনা কাল ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ। কবি নিজে তাঁর কাব্য মধ্যে গ্রন্থ রচনার কাল নির্দেশ করেছেন—

বেদ লয়ে ঋষি রস ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে ভবানন্দের মহাত্ম্য কীর্তনই তাঁর কাব্য রচনার মূল কারণ। ভবানন্দের মহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়েই প্রসঙ্গক্রমে দেবী অন্নপূর্ণার প্রয়োজন বোধ করেছেন। তাই কাব্যটিতে কাহিনীর পারম্পর্য ঠিকমত রক্ষিত হয়নি।

অন্নদামঙ্গলকাব্য তিনটি পৃথক খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বন্দনা, গ্রন্থসূচনার কারণ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা ইত্যাদির পর দেবী অন্নপূর্ণার মহিমা পৌরাণিক এবং লৌকিক আকারে বর্ণিত হয়েছে। পৌরাণিক অংশে দক্ষযজ্ঞ ও সতীর দেহত্যাগ, হর গৌরীর গার্হস্থ্য জীবন, অন্নপূর্ণার-মূর্তি-পরিগ্রহ, কাশীমাহাত্ম্য ইত্যাদি অংশের বর্ণনা আছে। লৌকিক অংশে হরিহোড়ের কথা এবং হরিহোড়ের গৃহত্যাগ করে ভবানন্দ ভবনে অন্নপূর্ণার যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড মানসিংহের বর্ধমান আগমন এবং সুন্দরের সুড়ঙ্গ দেখে বিদ্যাসুন্দরের কাহিণী শ্রবণ।

তৃতীয় খণ্ডে ভবানন্দ বিষয়ক অর্থাৎ ভবানন্দের উন্নতি হতে মৃত্যু পর্যন্ত সমূহ কাহিনী এই অংশে বর্ণিত হয়েছে। মানসিংহের বাংলায় আগমন, ভবানন্দের সহায়তায় প্রতাপাদিত্যের পরাজয়, ভবানন্দের দিল্লীগমন এবং দিল্লীর দরবার হতে 'রাজা' উপাধিলাভ এবং ভবানন্দের স্বর্গারোহণ এই খণ্ডের অন্তর্গত।

ভারতচন্দ্র প্রথম গ্রাম্যতা দোষ-দুষ্ট সাহিত্যের উপর নাগরিক সভ্যতার প্রলেপ দিয়েছেন। এই কারণে তাঁকে পুরাতন যুগের শেষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলা হয়। ভারতচন্দ্রের কাব্যেই আধুনিক কালের যুগলক্ষণ সূচিত হয়েছিল। কবির কাব্যের ভাষার চাকচিক্য এবং বাক্‌বৈদগ্ধ্য তাঁর আরবী, ফরাসী এবং সংস্কৃত ভাষা-জ্ঞান থেকেই আহরিত হয়েছে।

বিদগ্ধ জনোচিত এই ভাষাই ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রাণ। ভবানন্দ ভবনে দেবী অন্নদার নদীপার হয়ে যাওয়ার সময়কার বর্ণনা সত্য সত্যই আমাদের বিস্মিত করে—

ভবাণী বলেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥
পাটনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙা চরণ॥
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিলা অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে॥

কবি নানা সংস্কৃত ছন্দের পরীক্ষা করেছেন অন্নদামঙ্গল কাব্যে।

১. মৈল দক্ষ ভুত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দোবন্ধ বাড়িছে॥ (তূণক ছন্দ)

২. ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥ (ভুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দ)

৩. আই আই ওই বুড়া কি
এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে
হৈল দিগম্বর লো॥ (গ্রাম্য ধামালী ছন্দ)

অলঙ্কার প্রয়োগেরও কবির দক্ষতা খুবই উল্লেখযোগ্য—

১. অতিবড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুণ॥ (শ্লেষ)

২. চন্দ্র সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি পায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥ (যমক)

৩. কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদ নখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥ (অতিশয়োক্তি)

ভারতচন্দ্রের ভাষা এতই তীক্ষ্ণ এবং অর্থবহ যে পরবর্তীকালে তা প্রবাদ প্রবচনের মর্যাদা পেয়েছে—

১. 'নীচ যদি উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে'।
২. 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ॥'
৩. 'বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।'
৪. 'যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।'

ভারতচন্দ্র হাস্যরস সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়। কাব্যের যত্রতত্র হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখাতে পারেননি।

তবে ঈশ্বর পাটনীর চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ঈশ্বর পাটনী দেবী অন্নদার কাছে বর চেয়েছেঃ 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'—এই একটি পঙক্তির মধ্য দিয়ে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস ফুটে উঠেছে। হীরা মালিনীর চরিত্রটিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। হীরাও তাঁর লেখনীর যুগোচিত বাস্তব চরিত্র। হীরা সম্বন্ধে তাঁর সরস বর্ণনা বাস্তব ও বিদ্রূপ বাণে তীক্ষ্ন—

'কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
চূড়া বাঁধা চুল পরিধানে সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ি বাড়ি॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুড়া আছে শেষে॥'

কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে তাঁর "চরিত্রের মধ্যে কোন রক্ত মাংসের ব্যক্তি মানুষ নেই।" ভারতচন্দ্রের কাব্যে অশ্লীলতা আছে তবে তা বাক্‌চাতুর্যের শিল্পগুণে অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের তুলনায় এই অশ্লীলতা খুবই নগণ্য। কেউ কেউ অভিমত পোষণ করেছেন যে 'তাঁহার মধ্যে যে অশ্লীলতা আছে, তা ভাব বা অর্থগত অশ্লীলতা।'

ভারতচন্দ্র রাজসভার কবি। তাই তাঁর ভাব, ভাষা ও উপস্থাপনার মধ্যে মার্জিত রুচি এবং নাগরিকতার প্রকাশ বেশি। তিনি তাঁর কবি প্রতিভাকে মঙ্গলকাব্য রচনার বাঁকা স্রোতে প্রবাহিত না করলে কাব্য ক্ষেত্রে তিনি যুগান্তকারী সাফল্য রেখে যেতে পারতেন। তবুও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল-গান রাজকন্ঠে মণিমালার মত, যেমন তাঁর উজ্জ্বলতা, তেমন তার কারুকার্য।"

ভারতচন্দ্র যে যুগের পরিমন্ডলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে যুগের ইতিহাসে তিনি কাব্যক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

শাক্ত পদাবলী ও বাউল

চতুর্দশ অধ্যায়	সামাজিক পটভূমিতে শাক্ত পদাবলী ও বাউল রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত লালনফাকির

ক. শাক্ত পদাবলী : সামাজিক পটভূমিকা

যে সামাজিক পটভূমিকায় মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল শাক্ত পদাবলী রচনার সময়ের সামাজিক পটভূমিকা ছিল আলাদা। তুর্কী বিজয়ের দূরতম ফল হিসেবে মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই সময়ে অভিজাত ও অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেদের সাংস্কৃতিক মিলন ঘটেছিল। শুধু তাই নয় পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্বও কমে এসেছিল। মধ্যযুগের গ্রামগুলি এই সমাজ চেতনার ধারক ও বাহক ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি পাঠান রাজত্বের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময় ভূমি ব্যবস্থার নূতন বিন্যাসের জন্য অভিজাত জমিদার শ্রেণী ও সাধারণ মানুষদের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। হোসেন শাহের সময়ে অর্থনৈতিক অবস্থা যতটা ভাল ছিল তাঁর অবসানের পর বাংলা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ নিম্নগামী হতে থাকে।

এর পরে ঘটে ইউরোপীয় বণিকগণের আবির্ভাব। অল্প দিনের মধ্যে বণিকদের হাতেই চলে যায় দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্য। সমসাময়িক বর্গীর হাঙ্গামা বাংলা দেশের উপর আর একটি বিপর্যয় টেনে আনে। ফলে, সাধারণ শ্রেণীর জীবন যাত্রার মধ্যে একটি অস্থিরতা ও ভয় ত্রস্ততা বিরাজ করছিল। ইউরোপীয় বণিকগণের আগমনের ফলে এবং তাদের সহায়তায় আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মানুষ নূতন করে অর্থসম্পদের অধিকারী হয়েছিল। এরা বিলাসের মধ্যে নগর জীবনের সুখ ও সম্পদ উপভোগ করত। গ্রাম বাংলার মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাত। সমাজে আবার ধনীও দরিদ্রের মধ্যে বিরাট বৈষম্য দেখা দিল। গ্রামগুলি অবহেলিত হতে থাকল। এতদিন যে গ্রাম কেন্দ্রিক সুস্থ সাহিত্য রচিত হচ্ছিল তা ক্ষয় প্রাপ্ত গ্রামগুলিকে আঁকড়ে পড়ে রইল। সমাজ জীবনের এই দ্রুত পরিবর্তন—সাহিত্যের উপর দারুণভাবে আঘাত হানতে শুরু করল।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরই যে কোন কারণেই হোক বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে নানা গোষ্ঠী বিভাগ দেখা দেয়—এবং তন্ত্রের প্রভাবে তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে। তবে চৈতন্য দেবের আন্তর প্রভাব সাহিত্য ও শিল্পকলার উপর মাণ্ডলিকতার প্রলেপ দিয়েছিল। তবুও প্রকাশ্যে শাক্ত প্রভাব সমাজে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ঠিক এই

সময়েই রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে চলে। আলিবর্দী'র সময় এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটা আয়ত্তে এলেও সিরাজদৌলার সময় তা একেবারেই ভেঙে পড়ে। সাধারণ মানুষের উপর করাভার প্রবল আকার ধারণ করে। প্রজা সাধারণ শাসক শ্রেণীর কাছে আবেদন নিবেদন করেও তাদের দুঃখ দৈন্যের অবসান ঘটাতে পারে নি। কারণ শাসকরাই শোষক। মানুষ যখন মানুষের কাছ থেকে কোন প্রতিকার না পায় তখন দুর্বল মানুষ তার অভিযোগ জানায় ঈশ্বরকে। আগেই বলা হয়েছে এই অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সময় বাংলাদেশে শাক্ত-তন্ত্র ধর্ম সোচ্চার ছিল। তন্ত্রোক্ত এই শক্তি দেবী হচ্ছেন কালী। শোষিত শ্রেণীর প্রতীভূ কবিরা তাদের দুঃখ আর্তি'র কথা তাঁদের কাব্যের মাধ্যমে শক্তি দেবীর উদ্দেশ্যে জ্ঞাপন করলেন। সম্পূর্ণ সমাজ উদ্ভূত প্রতিবাদের এই আর্ত ক্রন্দনেরই বাণীরূপ হচ্ছে শাক্ত পদাবলী। আগমনী, বিজয়া, ভক্তের আকুতি প্রভৃতি সমস্ত স্তরের গানের মধ্যে ফুটে উঠল সামাজিক অবক্ষয়, কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, শোষণ ও ব্যর্থতার গ্লানিময় অভিযোগ। মানুষের চেয়ে দেবীই হলেন আপামর জনসাধারণের আপন জন।

ভূমিকা

বৈষ্ণব পদাবলীর নিদর্শনে হয়ত শাক্ত বিষয়ক কবিতাবলীর নামকরণ করা হয়েছে 'শাক্ত পদাবলী'। অবশ্য একথা ঠিক বৈষ্ণব ভাবধারার অনুকরণে পরবর্তীকালের শাক্ত পদাবলীতে বাৎসল্য, স্নেহ, মান অভিমান ইত্যাদি ভাব পর্যায় অবলম্বন করে কবিরা কাব্য রচনা করেছেন। শ্যামা অথবা কালীকে নিয়ে কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা আরম্ভ হয়েছে সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে। শ্যামা অথবা কালীকে নিয়ে গীত রচনা হয়েছে আরও পরে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'কালিকামঙ্গল' কাব্য ঠিক প্রথানুযায়ী মঙ্গল কাব্যের আওতায় পড়ে না। কারণ দেবী কালিকা নিশ্চয়ই তান্ত্রিক দেবী। কিন্তু কালিকামঙ্গল কাব্যগুলিতে দেবীকে তান্ত্রিক দার্শনিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয় নি। শুধুমাত্র 'কালী' বা 'শ্যামা' নামের জোরে কাউকে তান্ত্রিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলিতে দেবী কালিকার কোন তান্ত্রিক ঐতিহ্য স্বীকৃত হয় নি। এ জন্যই এ কাব্যকে প্রথানুযায়ী 'কালিকামঙ্গল' কাব্য বলা যুক্তি সঙ্গত নয়।

অনুরূপভাবে বৈষ্ণব পদাবলী ও শাক্ত পদাবলী এই দুই ধারার গীতাবলীর নামকরণের মধ্যে আংশিক সাযুজ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। কারণ বৈষ্ণব পদাবলী ধর্মচেতনাকে আশ্রয় করে রচিত। এর মধ্যে বৈষ্ণব দার্শনিকতার দিকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে শাক্ত পদাবলী তন্ত্র চেতনার মধ্যে রচিত হলেও ধর্মাশ্রিত নয়। কারণ শাক্ত পদাবলীর কবিরা এই গীতগুলি রচনার সময় তাঁরা শাক্ত চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলেও কবিতাগুলি সমাজ আশ্রিত।

তার কারণ, পরিপূর্ণ ধর্মাশ্রিত কবিতা হলে 'আগমনী' ও 'বিজয়ার' পদগুলি শাক্ত পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হত না। আগমনী ও বিজয়ার পদগুলি পুরোপুরি কবিদের সমাজ চেতনা নির্ভর পদ। তা ছাড়া আর একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে শাক্ত তান্ত্রিক ধর্মে কিছু আচরণীয় ক্রিয়া কাণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ। গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূলে আছে নিষ্ঠাভাব—আচরণীয় ক্রিয়া কাণ্ডের ভূমিকা অনেক শিথিল। এই দৃষ্টি কোন থেকে রামপ্রসাদ সেনের কাব্য বিচার করা প্রয়োজন। কারণ রামপ্রসাদ ছিলেন সিদ্ধতান্ত্রিক সাধক। এই সিদ্ধতান্ত্রিক চেতনার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি শাক্ত গীতি রচনা করেছিলেন।

আর একটি ব্যাপার এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। রামপ্রসাদ যে সামাজিক পটভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সে সময় সামাজিক অবক্ষয়ের যুগ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার যুগ। সামাজিক অবক্ষয় এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা সে যুগের বাঙালীর অর্থনৈতিক অবস্থাকে প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছিল। ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে তাঁর আবির্ভাব। সমাজব্যবস্থার এমনি পরিবেশের মধ্যে রামপ্রসাদ লেখনী ধরেছিলেন। তাঁর অনুকারী পরবর্তী শাক্ত পদকর্তা কমলাকান্ত, দাশরথি রায়, রামদুলাল নন্দী ইত্যাদিরাও একই সামাজিক-চেতনাশ্রিত কবি।

কবি ও কাব্য পরিচিতি

১. রামপ্রসাদ সেন

আনুমাণিক ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে কুমার হট্টে (বর্তমান হালি শহর অঞ্চল) রামপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়। বয়সে তিনি কবি ভারতচন্দ্রের চেয়ে কয়েক বছর ছোট ছিলেন। রামপ্রসাদের পিতার নাম রাম রাম সেন। রামপ্রসাদ রাম রাম সেনের দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। রামপ্রসাদের দুইপুত্র ও দুই কন্যা ছিল। রামরাম সেন অবস্থাপন্ন ছিলেন; কিন্তু পিতার অবস্থার পরিবর্তন হওয়ার ফলে রামপ্রসাদকে জীবিকার্জনের জন্য সচেষ্ট হতে হয়। শোনা যায় জীবিকার জন্য তিনি কোলকাতার কোন জমিদারের সেরেস্তায় খাতা লেখা মুহুরির কাজে নিযুক্ত হন। সেরেস্তার কাজের মধ্যেই তিনি আনমনে খাতায় গান লিখে ফেলতেন। জমিদার একথা জানতে পেরে তাঁর মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দেন এবং কাব্যচর্চা করার জন্য অনুরোধ করেন। রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রও তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে একশ বিঘে জমি দান করেছিলেন এবং 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়েছিলেন।

রামপ্রসাদ সম্পর্কে আরও গল্প আছে। স্বয়ং জগজ্জননী তাঁর ভক্তির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর কন্যারূপে বেড়া বাঁধায় সাহায্য করেছিলেন। রাম প্রসাদ গৃহী সাধক ছিলেন। তাঁর সাধন পীঠ ছিল হালিশহরে। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে গেছেন এবং বাংলা সাহিত্যে যে অবদান রেখে গেছেন তার নাম 'রাম প্রসাদী সঙ্গীত' এবং এই সঙ্গীতের যে সুর তিনি নিজে দিয়ে গেছেন তা 'প্রসাদী

সুর' নামে পরিচিত। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামাপূজার বিসর্জনের সন্ধ্যায়, শোনা যায়, তিনি নিজেই সজ্ঞানে দেবীর সঙ্গে জলে আত্মবিসর্জন দেন।

প্রথম জীবনে রামপ্রসাদ রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় নামে এক জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় 'কালীকীর্তন' রচনা করেছিলেন। এর পরেই তিনি 'কালিকা মঙ্গল কাব্য রচনা করেন। রামপ্রসাদের 'কালিকা মঙ্গল' অথবা বিদ্যাসুন্দর কাব্য খুবই অশ্লীল এবং স্থূল রুচির পরিচায়ক। রামপ্রসাদের এই কাব্য হতে তৎকালীন গ্রামীন জীবনের পচনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সমসাময়িক দুই কবি রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের রচনা সমধর্মী নয়—তার কারণ এই দুই কাব্যের রচয়িতাদের সৃজন পরিবেশ ছিল ভিন্ন। একজন কাব্য রচনা করেছেন গ্রামীন পরিবেশে অপরজন সম্পূর্ণ নাগরি পরিবেশের মধ্যে কাব্য রচনা করেছেন।

রাম প্রসাদের সার্বিক কৃতিত্ব শাক্ত পদাবলী বিষয়ক আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি রচনার মধ্যে দিয়ে। অসামান্য ভক্তিরস সিঞ্চিত শ্যামা বিষয়ক গানগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য-সম্পদ। গানগুলির ভাষার সারল্য এবং ভাবের মাধুর্য হৃদয়ের গোপন দুয়ারে সহজেই আবেদন জাগায়। শাক্ত পদাবলী দু'ধারায় বিভক্ত ; এক. উমা সঙ্গীত ও দুই. শ্যামা সঙ্গীত। উমা সঙ্গীতের মধ্যে রয়েছে আগমনী ও বিজয়ার গান এবং শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে কিছু তত্ত্ববিষয়ক গান।

রামপ্রসাদ উমা সঙ্গীত বিশেষ না লিখলেও এই ধারার গানগুলির মধ্য দিয়ে সহজ ও সরল স্নেহ বাৎসল্য ও হৃদয়াবেগের দিকটি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। উমা বিষয়ক গানগুলির পশ্চাৎপট প্রসঙ্গে আগেই বলা হয়েছে যে এগুলির পেছনে তৎকালীন সমাজের বাল্য বিবাহ প্রথা, বহু বিবাহ প্রথা ইত্যাদির কু-ফল বর্তমান। আগমনী ও বিজয়ার গানগুলির মধ্য দিয়ে পিতৃ হৃদয়ের এবং মাতৃহৃদয়ের কন্যা প্রীতি-স্নেহও ভালবাসার চিত্রটি যেমন পরিস্ফুট তেমনি কন্যার বিদায়কালীন দৃশ্যটি খুবই বেদনাহত ও শোকাবহ। গিরিরাজ হিমালয় এবং মা মেনকার কন্যা উমা ; তিন দিনের জন্য উমা প্রতিবছর পিতৃ গৃহে আসেন। তারপর কৈলাসে স্বামীগৃহে ফিরে যান। পিতৃগৃহে কন্যার আসা এবং আবার পিতৃগৃহ হতে স্বামী গৃহে ফিরে যাওয়ার বিষয়ই যথাক্রমে আগমনী ও বিজয়ার গানগুলির বিষয়বস্তু। হিমালয় এবং মেনকার কন্যা প্রীতি এবং কন্যার জন্য দুঃখ সবই বাঙালী পিতামাতার আশা-আনন্দ এবং দুঃখ-বেদনার প্রতিরূপ।

রামপ্রসাদের আগমনী গানে মাতৃহৃদয়ের এমনি আশংখা ও আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে—

গিরি এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।
বলে বলুক লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না ॥
যদি এসে মৃতুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
মায়ে-ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না ॥

এ গানের বক্তব্যের মধ্যে প্রসঙ্গত বাল্যবিবাহের কু-ফল এবং সেকালে দরিদ্র বাঙালী পরিবারের চিত্রটি ফুটে উঠেছে।

শ্যামা সঙ্গীতে রাম প্রসাদের অনবদ্য অবদান সর্বজন বিদিত। সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ এই গানগুলির মধ্যদিয়ে একটি দুঃখ বেদনার সুর তুলে ধরেছেন। আগেই বলা হয়েছে এ গানগুলির মধ্যে ধর্মীয় তত্ত্বের দিক অপেক্ষা সামাজিক জীবনের অভাব অনটনের কথাই বেশি ধরা পড়েছে। রামপ্রসাদ এই গানগুলির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আশ্রয় খুঁজেছেন। প্রজা সাধারণের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করেন রাজা অর্থাৎ শাসক শক্তি। কিন্তু শাসক যদি অত্যাচারী হয় অথবা শোষক হয় তখন মানুষ অত্যাচারের প্রতিবাদ জানায় ভগবানের কাছে। রামপ্রসাদ এই গানগুলির মধ্য দিয়ে 'মা' অর্থাৎ শ্যামা মায়ের কাছে শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অষ্টাদশ শতকের বাংলাদেশের অত্যাচার পীড়িত সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনার কথা এই ভাবে রাম প্রসাদের গানের মধ্য দিয়ে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

সেজন্যে একদিকে অধ্যাত্ম অনুভূতি অন্যদিকে সামাজিক অনুভূতি রাম প্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত সুর—

'মাগো তারা, ও শঙ্করী,
কোন বিচারে আমার প'রে করলে দুখের ডিক্রীজারী ?
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে ঐ ছয়টারে বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি ॥

ব্যক্তি উপলব্ধিকে সামাজিক আর্তির সঙ্গে যুক্ত করে রাম প্রসাদ সে যুগের বাঙালীর জীবন কাব্য রচনা করেছেন। নিম্নের গানটিতে বহুবিবাহ এবং কুলীন প্রথার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা,
আমার কেউ নাই শঙ্করী হেথা।
মার সোহাগে বাপের আদর, এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।
যে বাপ বিমাতাকে ধরে শিরে,
এমন বাপের ভরসা বৃথা ॥'

রামপ্রসাদ জন মানসে রূপকের মাধ্যমে অধ্যাত্ম চেতনার সুরটি নানা কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গানের উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে দেওয়া হলো—

মন রে কৃষি কাজ জান না
এমন মানব-জমিন রইল পতিত—
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

কবির গানের মধ্যে একটা দুঃখ বেদনার সুর প্রায়ই অনুরণিত। এই দুঃখ বেদনা অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকের সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবন থেকে উত্থিত। দুঃখ

বিড়ম্বনাতেও বাঙালী মরে নি। শত দুঃখের মধ্যেও বাঙালী তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। মায়ের কাছে সেই আবেদনই কবি করেছেন—

আমি কি দুঃখেরে ডরাই ?
দুখে দুখে জনম গেল
আর কত দুঃখ দেও দেখি তাই।
আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোন খানেতে যাই ;
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে—
দুখ দিয়ে মা বাজার মেলাই।
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি, বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই ॥

শাক্ত পদাবলীতে ভক্তের এই আকুতি খুবই মর্মস্পর্শী। রামপ্রসাদের কাছে তাঁর শ্যামা মা যেন বাঙালী জননী। তার কাছে অভিমান, আক্ষেপ, হতাশা সবই সন্তান যেমন ভাবে প্রকাশ করে কবি তেমন ভাবে সব কিছুই মায়ের কাছে প্রকাশ করেছেন। শাক্ত পদাবলীর এই আন্তরিকতার সুরটি খুবই মধুর। কবি প্রচলিত ভাষায় সহজ ও সরলভাবে অধ্যাত্ম চেতনার সুরটিকে যেমন প্রকাশ করেছেন—তেমন ভাবেই সে যুগের বাঙালী জীবনের শোষিত বেদনা-ঘন চিত্রটি তুলে ধরেছেন। এখানেই রাম প্রসাদের কৃতিত্ব।

২. কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য শাক্ত পদাবলীর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য কবি। বর্ধমান জেলার কালনার অন্তর্গত অম্বিকানগরে তাঁর জন্ম হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কোটালহাটে তিনি বাস পরিবর্তন করেন। শৈশবে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে, সেজন্যে তিনি চেন্নাগ্রামে মাতুলালয়ে চলে আসেন। সেখানে তিনি শিক্ষালাভ করেন। মাতুলালয়ে থাকাকালীন তিনি বর্ধমানের রাজপরিবারের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর কবিত্বের এবং পাণ্ডিত্যের প্রভাবেই তিনি বর্ধমানের রাজ পরিবারের অনেকের গুরুপদে আসীন হন। পরে তিনি বর্ধমান রাজ তেজশ্চন্দ্রের সভাকবি হন। বর্ধমানের নিকটবর্তী কোটালহাটে তাঁর সাধন পীঠ ছিল। সাধক এবং কবি হিসেবেই তিনি জন সমাজে শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু সম্বন্ধে সঠিক কোন কিছু জানা যায় না। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দশকে তিনি দেহত্যাগ করেন।

কমলাকান্তের গানগুলির ভাব ও ভাষা রামপ্রসাদের রচনার মতই হৃদয়গ্রাহী এবং মর্মস্পর্শী। তাঁর কাব্যের প্রধান গুণ আধ্যাত্মিক আর্তি এবং গভীর ও নিবিড় হৃদয়াবেগ। তাঁর কাব্যের ভক্তিরস সংযত এবং সংহত ভাবে তাঁর কাব্যকে সুষমা মন্ডিত করে তুলেছে।

'মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীল কমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল।
দেখ সুখ দুঃখ সমান হল আনন্দ সাগর উথলে॥

গানটির মধ্যে সাধক মনের সহজ প্রকাশ স্বয়ং রামকৃষ্ণ দেবকেও আকৃষ্ট করেছিল, তিনি এই গানটি প্রায়ই গাইতেন।

তিনি তাঁর শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে তত্ত্ব ও ভক্তির মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিত্ব শক্তির গুণে কোন কিছুই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি—

'জান নারে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দনুজ তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥'

আগমনী বিজয়ার গান রচনায় কবির দক্ষতা আরও বেশি। এই শ্রেণীর গান রচনায় তিনি অনেক ক্ষেত্রে রামপ্রসাদকে অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর এই শ্রেণীর গান রচনার মধ্যে ভাবের ক্রম ও অনুধাবন করা যায়। আন্তরিকতা, স্নেহ-বাৎসল্যের সুর আগমনী ও বিজয়ার গানগুলিতে খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। নিম্নলিখিত গানটির মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলতা লক্ষ্যণীয়—

আঙ্গিনার বাহিরে, হেরিয়ে গৌরীরে, দ্রুত কোলে নিলরাণী।
অমিয় বরষি উমা মুখ শশী চুম্বয়ে যেন চকোরিনী॥

অথবা,

আমি কি হেরিলাম নিশি-স্বপনে!
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথা গেল হে।
আধ আধ মা বলিয়ে বিধু বদনে!

রামপ্রসাদ এবং কমলা কান্ত উভয়েই সে যুগের সমাজ জীবনের দুঃখ বেদনাকে আধ্যাত্মিক মাণ্ডলিকতায় আবরিত করে শাক্ত পদাবলী রচনা করেছিলেন। সমাজ জীবনের আর্তি এবং হাহাকার সে যুগের কবিদের আকুতির মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল শাক্ত পদাবলীর স্বরূপ অবয়বের কবিতার মধ্যে।

খ. বাউল

"মনের মানুষ থাকে মনে মনে
তা'রে চিনব কেমনে।"

বাংলার লোক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা 'বাউল'। 'বাউল' কথাটির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা জন নানা মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেছেন

'বাউল' শব্দটির উৎস 'ব্যাকুল' অথবা 'বাতুল' শব্দ হতে। আবার অনেকে হিন্দী 'বাউর' অথবা আরবী 'আউল' শব্দ হতে উদ্ভূত বলেও মত প্রকাশ করেছেন। 'আউল' শব্দের অর্থ 'ঈশ্বরের একান্ত সেবক' ; বাতুল এবং 'বাউর' শব্দের অর্থ 'বায়ুরোগ গ্রস্ত'। বাউল শব্দটিকে সুফীশব্দ 'দিওয়ানা' শব্দের সঙ্গেও অনেকে তুলনা করেছেন। এই সব শব্দগুলির সমন্বিত অর্থই 'বাউল' শব্দের দ্যোতক। সাধারণত বাউল বলতে আমরা বুঝি সম্প্রদায় বর্জিত খোলা মনের ঈশ্বর ব্যাকুল মানব সম্প্রদায়। এদের উপর বৈষ্ণব সহজিয়া এবং ইসলামের সুফী ধর্মের প্রভাব বর্তমান। ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর Obscure Religious cult গ্রন্থে এ বিষয়ে সুন্দর অভিমত প্রকাশ করেছেন ঃ "The Bauls belonging to the Hindu Community are genarally Vaisnavite in their faith and those belonging to the Muslim Community are genarally Sufi-istic and in both the schools the emphasis is on the mystic conecption of divine love." ডঃ দাশগুপ্তের মতে বাউলদের 'মনের মানুষ' উপনিষদের 'পরমাত্মা', সহজিয়াদের 'সহজ' এবং সুফী সম্প্রদায়ের 'প্রিয়তমার' সমন্বিত রূপের মধ্যে আবদ্ধ।

বাউলদের একটি নিজস্ব সাধন পদ্ধতি আছে। যারা বাউল নয় এ পদ্ধতি তাদের জানার কথা নয়। এই পদ্ধতির মধ্যে কিছু তন্ত্র সাধনা, যোগ সাধনা ইত্যাদি মিশে আছে। বাউলরা দেহ সাধনায় বিশ্বাসী। তাঁদের মতে, "যা আছে ভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে।" অর্থাৎ নরনারীর দেহ সম্পর্কই এই সাধনার মূল অঙ্গ। নানা রহস্যময় সঙ্কেত ও প্রতীক তত্ত্বের দ্বারা তারা এই সাধনা করে থাকেন। বাউলদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে। যেমন সাঁই, আউল, কর্তাভজা, দরবেশী ইত্যাদি। এঁদের প্রত্যেকেরই সাধন ভজনের মধ্যে অল্প বিস্তর পার্থক্য থাকলেও দেহসর্বস্ব সাধনাই সকল শ্রেণীর বাউলের মূল লক্ষ্য।

বাউলরা তাদের সাধনার রীতি নানা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর লোক সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে বাউল গান খুবই উল্লেখযোগ্য। এদের ঈশ্বর অর্থাৎ 'মনের মানুষ'। এই মনের মানুষকে খোঁজার জন্য মরমী সুর সাধনাই বাউল গানের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই বাউলের সাধের একতারার অনুরননের সঙ্গে সঙ্গে মর্মরিত হয়ে ওঠে—

আমি কোথায় পাব তা'রে
আমার মনের মানুষ যে রে !
আমি হারায়ে সেই মানুষে,
ঘুরে মরি দেশ বিদেশে।

ঈশ্বর প্রেমী, সম্প্রদায়হীন, সংসার বিমুখী ও উদাসী এই মানব সম্প্রদায়ের উদ্ভব অষ্টাদশ শতকের শাসক কর্তৃক অত্যাচারিত ও শোষিত সমাজ হতেই। মানুষ

যখন শাসকের উপর আস্থা হারায় তখন সে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হয়। আবার সমাজে যখন ধর্ম বিশ্বাসের উপর আঘাত আসে তখন মানুষ নানা ধর্ম মতকে সমন্বয় করে তার মধ্যে আশ্রয় খোঁজে। তুর্কী আক্রমণের পর বাংলা দেশের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল অভিজাতও সাধারণ শ্রেণীর মিলনের ফলে। সুফীধর্ম ও চৈতন্যদেবের মানবতাবাদী বৈষ্ণব ধর্ম মানুষকে পরস্পরের কাছাকাছি এনেছিল। তারপর চৈতন্যদেবের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের নানা সম্প্রদায় শাক্ততন্ত্রের প্রবাহে যখন কোন ঠাসা—ঠিক তখনই আমাদের সমাজ জীবনে এবং রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক জীবনে নেমে এল চরম অস্থিরতা। যার অনিবার্য আঘাত এসে লাগল নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপর। রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অভিঘাতে ঘর ছাড়া এক বিবাগী সম্প্রদায় বাইরের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্তর্মুখী হলো। তারাই 'মনের মানুষ' খোঁজার জন্যে একতারা সম্বল করে পথে নামলো। এরাই বাউল। এরা আজও তাঁদের মনের মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে—

'মনের মানুষ থাকে মনে মনে
তারে চিনব কেমনে।'

যুগ যুগ ধরে বহু বাউল তাঁদের মনের মানুষ খোঁজার জন্য হাজার হাজার সঙ্গীত রচনা করেছেন। সেগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

লালন ফকির

লালন ফকির বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর রচিত গানগুলি 'লালন গীতি' নামে পরিচিত। বাউল গান হিসেবে লালনের গান সকলের উর্ধে। লালনকে জনসমক্ষে তুলে ধরেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে জমিদারির কাজ দেখার জন্য যান তখন তিনি বাউল সাধক লালনের একটি গানের খাতা পান। গানগুলি কবিকে খুবই আকর্ষণ করে। লালনের গানের অন্তর্নিহিত সুরের সঙ্গে কবি মনের যোগ ছিল। কবি যেমন 'সীমার মধ্যে অসীমের' সন্ধান করেছিলেন—লালনের গানে মধ্যে এমন একটি অসীম সত্বাকে অন্বেষণ করার বারতা ছিল। কবি এই গানগুলির সঙ্গে একটি মানসিক আত্মীয়তার সম্পর্ক খুঁজে পান। পরবর্তী কালে তাঁর বহু গান ও কবিতার মধ্যে বাউলের আন্তরভাবে অনুরণন দেখা যায়। তবে কবির সঙ্গে লালনের সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

লালন ফকিরের জন্ম বা জীবন কথা সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। লোক মুখে শোনা নানা তথ্য হতে এবং কিছু তথ্য প্রমাণ হতে লালন সম্বন্ধে যা জানা যায় তাও যথেষ্ট নয়।

অনেকে মনে করেন লালনের জন্ম ১৭৭০ থেকে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে। কুষ্ঠিয়া জেলার কুমার খালির কাছাকাছি সেঁউড়িয়া অথবা ছেঁউড়িয়া

গ্রামে লালনের বাসস্থান ছিল। জন্মসূত্রে লালন হিন্দু কায়স্থ ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। বিয়ের পর তিনি একবার তাঁর গ্রামের লোকদের সঙ্গে তীর্থযাত্রা করতে পুরী যাচ্ছিলেন। ফেরার পথে তিনি বসন্তরোগাক্রান্ত হন এবং মুমূর্ষু অবস্থায় সঙ্গী সাথী কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। সে সময় এক মুসলমান ফকির দম্পতির সেবা শুশ্রূষায় লালন জীবন ফিরে পান। তখন তিনি 'ফকিরী' ধর্ম গ্রহণ করে 'লালন শাহ ফকির' নামে পরিচিত হন।

লালনের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। মুসলমান শিষ্যদের মধ্যে কিছু মোমিন সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি এই সম্প্রদায়ের একটি কন্যাকে বিয়ে করে সেঁউড়িয়াতে আখড়া নির্মাণ করে সাধন ভজনে আত্মনিয়োগ করেন। লালন শাহ সাধনার উচ্চতম শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে একটি প্রচলিত ছড়া আছে—

'আউল বাউল দরবেশ সাঁই,
সাঁইয়ের উপরে আর নাই।'

লালনের গুরুর নাম সিরাজ সাঁই। লালনের একটি দলিল পাওয়া গেছে। সেখানে পিতার নাম উল্লেখ আছে সিরাজ সাঁই। ফকির-সন্ন্যাসীদের পিতৃনাম করতে নেই। মনে হয় লালন গুরুর নামই পিতৃপরিচয় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। লালনের কোন জাত বিচার ছিল না। লালন নিজের জাতির পরিচয় দিয়েছেন—

"সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে।
লালন ভাবে জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে॥"

অথবা "সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন।
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান॥"

লালন ফকিরের গানের ভাষা খুবই সহজ ও সরল। তিনি তাঁর মনের মানুষ খোঁজার জন্য সহজভাবে তাঁর কথা গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতাতে কখনো বৈষ্ণব সহজিয়া ভাব আবার কখনো সুফী ভাব প্রকাশ পেয়েছে। একটি সুফীভাবাপন্ন গানের উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হলো—

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরশীনগর
এক পড়শী বসত করে।"

সহজিয়া ভাবের গান—

এই মানুষে দেখ সেই মানুষ আছে,
কত মুনি ঋষি চারি যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
সে চাঁদ ধরতে গেলে হাতে কে পায়
ওযে, আলোক মানুষ তেমনি সাদায়
আছে আলোকে বসে……

বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গান—

সে ভাব সবাই কি জানে !
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীর সনে।
গোপী বিনে জানে কেবা শুদ্ধ রস অমৃতসেবা
গোপীর পাপপুণ্য জ্ঞান থাকে না কৃষ্ণ দরশনে।

লালনের দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী
দিতাম তাহার পায়।
আট কুটুরী নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা কাটা
তার উপরে আছে সদর কোঠা
আয়না মহল তায়।

লালনের কবিতায় যে কোন গূহ্যভাব থাকুক না কেন বাইরের অর্থটি খুবই সহজ ও সরল। অন্তর্নিহিত অর্থের বিস্তারে দেখা যাবে কোন কিছু অন্বেষণের চিন্তাই তার কাব্যের মূল বিষয়। এই অন্বেষণ কার? সেই মনের মানুষের। মনের মানুষের খোঁজ করতে গিয়ে লালনের মানবিকতাবোধের কোন অভাব ঘটেনি। মনে হয়, এই মানবিকতাবোধই তার কবিতার মূল কথা।

পরিশিষ্ট

আদর্শ প্রশ্ন

প্রথম পর্ব

বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদভব, বাংলা সাহিত্যের গোড়াপত্তন ও যুগবিভাগ

১. বাঙালী জাতির উদ্ভবের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২. বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩. "বাঙালীর সংস্কৃতি 'মিশ্র সংস্কৃতি'—" আলোচনা কর।
৪. বাংলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন কোন্ সময় হতে? উপযুক্ত তথ্য-প্রমান দিয়ে তোমার বক্তব্য উপস্থাপিত কর।
৫. বাংলা সাহিত্য ক'টি যুগে বিভক্ত? প্রতিটি যুগের কাল সীমা নির্ণয় কর এবং যুগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

চর্যাপদ ঃ সমাজ চিত্র ও সাহিত্য সম্পদ

১. বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ কোন্ সময় থেকে সৃষ্টি হয়েছে? এ যুগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
২. বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক নিদর্শন কি? এগুলি কোথা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে? সেখান থেকে আবিষ্কৃত হবার কারণ কি? ঐ গ্রন্থের পরিচয় দাও।
৩. চর্যাপদে বাঙালীর সমাজ জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা কর।
৪. চর্যার সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর।
৫. চর্যাপদকে বাঙালীর আদিযুগের সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করার যুক্তি কি কি?
৬. সিদ্ধাচার্য কাদের বলা হয়? তারা কি ধর্মাবলম্বী ছিলেন। চর্যার কবিদের কাল নির্ণয় কর।

তুর্কী বিজয় ও তার ফলশ্রুতি—সামাজিক অবস্থা

১. বাংলাদেশে তুর্কীবিজয় এবং তুর্কীবিজয়ের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটি নিবন্ধ রচনা কর।
২. তুর্কীবিজয় কোন সময় হয়েছিল? সংক্ষেপে তুর্কী বিজয়ের ঐতিহাসিক পটভূমিকা উল্লেখ কর।
৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দী অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ"—আলোচনা কর।

৪. তুর্কীবিজয়ের পর বাংলার সামাজিক অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছিল? এই পরিবর্তনের ফল কি তা আলোচনা কর।

বড়ু চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন

১. 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যখানি কার লেখা? এটি কিভাবে আবিষ্কৃত হয়? কাব্যের অন্তর্গত কাহিনীটি লিপিবদ্ধ কর।
২. শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। বড়ু চন্ডীদাসের কবি প্রতিভা সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৩. 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যের অন্য নাম কি ছিল? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাব্যটির গুরুত্ব নির্ণয় কর।

বিদ্যাপতি ও তাঁর পদাবলী

১. বিদ্যাপতি কোন দেশের লোক ছিলেন? তিনি কোন ভাষায় পদাবলী রচনা করেছেন? তাঁর জীবনী ও কবি প্রতিভার পরিচয় দাও।
২. বিদ্যাপতির পদাবলীকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ কি? তাঁর পদাবলীর বৈশিষ্ট্য কি? পরবর্তী যুগের কোন্ কবির উপর তাঁর প্রভাব সূচিত হয়েছিল?
৩. কবি বিদ্যাপতি ও তাঁর পদাবলী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর।
৪. বিদ্যাপতির পদাবলী বাংলাদেশে কেন এত জনপ্রিয় হয়েছিল তার কারণ নির্ণয় কর।
৫. 'বিদ্যাপতি রাজসভার কবি'—এ উক্তি করার কারণ কি?
৬. উদ্ধৃতি সহ বিদ্যাপতির কাব্যের পরিচয় দাও।

চন্ডীদাস ও তাঁর পদাবলী

১. বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চন্ডীদাসের কৃতিত্ব নির্ণয় কর। পরবর্তী কোন্ কবির উপর তাঁর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।
২. চন্ডীদাসের পদাবলীর সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩. চন্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর তুলনা কর।
৪. চন্ডীদাসের কৃবিত্ব কোথায়? কি কারণে তিনি বাঙালীর হৃদয় জয় করেছেন?

অনুবাদ সাহিত্য ঃ কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী

১. অনুবাদ সাহিত্য সৃষ্টির কারণ কি? এই সাহিত্য সৃষ্টির পেছনে কি কি সামাজিক কারণ রয়েছে আলোচনা কর।
২. কৃত্তিবাসের রামায়ণের মৌলিকতা কতদূর তা বিচার কর।

৩. কৃত্তিবাস কে ছিলেন ? তাঁর রামায়ণের জনপ্রিয়তার কারণ কি ?
৪. কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণের অনুবাদের সঙ্গে বাল্মীকি রামায়ণের পার্থক্য কি ? কবির আত্ম পরিচয়' সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি ? কবির কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে কি জানা যায় ?
৫. বাঙালী জীবনে রামায়ণের প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৬. কৃত্তিবাস কোন্ রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন ? কৃত্তিবাসের রামায়ণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
৭. কবি কৃত্তিবাসের কাব্য এবং জীবন সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
৮. ভাগবতের অনুবাদ কে করেন ? তাঁর অনুবাদ কাব্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৯. মালাধর বসুর উপাধি কি ছিল ? তাঁর জীবন কথা এবং কাব্য সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।
১০. মালাধর বসুর কাব্যের প্রধান গুণ কি ছিল ?
১১. কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।
১২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর স্থান নির্ণয় কর।

মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ এবং মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজ জীবন

১. 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ কি ? মঙ্গলকাব্য কাকে বলে ? মঙ্গলকাব্য উদ্ভবের সামাজিক কারণ নির্ণয় কর।
২. মঙ্গলকাব্যের তৎকালীন সমাজ জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা উল্লেখ কর।
৩. মনসামঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা কর। এই কাব্যগুলিতে তৎকালীন সমাজ জীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লিপিবদ্ধ কর।
৪. মনসামঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে ? তাঁর জীবন এবং কাব্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৫. মনসা মঙ্গল কাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ কি ?
৬. মনসামঙ্গল কাব্যের যে কোন একজন কবির কাব্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।

সাহিত্য ও সমাজ জীবনে চৈতন্যদেব

১. চৈতন্যদেবের জীবন কথা সংক্ষেপে বিবৃত কর।
২. চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলাদেশের সাহিত্য ও সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩. বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৪. চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্মমত সে যুগের বাংলা সাহিত্যে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

চণ্ডীমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবি সহ কাব্যালোচনা

১. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা কর।
২. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর জীবন কাহিনী ও কাব্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৩. চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিচয় দিয়ে মুকুন্দ রামের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তা আলোচনা কর।
৪. কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলি সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লিখ।
৫. দ্বিজ মাধবের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৬. মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সে যুগের সমাজজীবনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা লেখ।
৭. 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলি সে যুগের সমাজ জীবনের দর্পন'—আলোচনা কর।

চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের প্রধান কবি ও কাব্যের পরিচয়

১. 'চরিত কাব্য' কাকে বলে? চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে যে 'চরিত' সাহিত্য শাখা গড়ে উঠেছিল তার উল্লেখ কর। এই কাব্য শাখার শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর কাব্য সম্বন্ধে যা যান লেখ।
২. বাংলা সাহিত্যে রচিত 'চরিত' কাব্যগুলির মধ্যে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৩. বৃন্দাবন দাসের জীবন ও কাব্য প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৪. লোচন দাসের কাব্যের নাম কি? তাঁর জীবন ও কাব্য প্রসঙ্গে যা জান লেখ।
৫. কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যের নাম কি? তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা জান লেখ। কৃষ্ণদাস কবিরাজের জীবন ও কবি প্রতিভা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর

পদাবলী সাহিত্য

১. 'পদাবলী' কাকে বলে? বৈষ্ণব পদাবলীর বৈশিষ্ট্য কি? চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যের বিশেষ দিকগুলি উল্লেখ কর।
২. বলরাম দাসের পদাবলী সম্পর্কে যা জান লেখ।
৩. 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' কাকে বলে? তাঁকে এইরূপ বলার কারণ কি? তাঁর জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৪. গোবিন্দদাস ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর পার্থক্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।
৫. জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাব শিষ্য কেন বলা হয়? জ্ঞানদাসের জীবন ও কাব্য প্রসঙ্গে যা জান লেখ।
৬. চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

ধর্মমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবি সহ কাব্যালোচনা

১. ধর্ম মঙ্গল কাব্যের কাহিনী সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।
২. ধর্ম মঙ্গল কাব্য কাকে বলে? এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৩. রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যের নাম কি? তাঁর জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ।
৪. ঘনরাম চক্রবর্তীর জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে সম্যক আলোকপাত কর।

কাশীরাম দাসের মহাভারত

১. অনুবাদ সাহিত্য কাকে বলে? মহাভারতের প্রথম অনুবাদ কে করেন? এই কাব্যের অনুবাদ দেরীতে হওয়ার কারণ কি?
২. মহাভারতের অনুবাদক হিসাবে কাশীরাম দাসের কৃতিত্ব উল্লেখ কর।
৩. কাশীরামদাসের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।

আরাকানের রাজ সভার প্রধান কবি সহ কাব্যালোচনা

১. আরাকানের রাজসভার প্রধান কবি কে কে ছিলেন? তাঁদের কাব্যের নাম কি? তাঁদের কাব্য রচনার ঐতিহাসিক পটভূমি সম্বন্ধে আলোচনা কর।
২. দৌলৎ কাজী কে ছিলেন? তাঁর রচিত কাব্যগুলির নাম উল্লেখ কর। তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য কোনটি? তাঁর জীবন কথা ও কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৩. সৈয়দ আলাওলের কবিপ্রতিভা ও কাব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

ভারত চন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল

১. ভারত চন্দ্র কোন শতকের কবি ছিলেন? তাঁর কাব্যের নাম কি ছিল? তাঁর কবিপ্রতিভা ও কাব্য সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।
২. ভারত চন্দ্রের কাব্যের সামাজিক পটভূমিকা আলোচনা কর।

সামাজিক পটভূমিতে শাক্ত পদাবলী ও বাউল

১. শাক্ত পদাবলী কাকে বলে। শাক্ত পদাবলী রচনার সামাজিক পটভূমি আলোচনা কর।
২. শাক্ত পদাবলীর সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর মৌল পার্থক্য কোথায় আলোচনা কর।
৩. শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি কে? তাঁর সম্বন্ধে এবং তাঁর কাব্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৪. কমলাকান্তের পদাবলী সম্বন্ধে কি জান সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
৫. কবি রামপ্রসাদ সেনের জীবন ও কাব্য প্রসঙ্গে আলোচনা কর।
৬. 'বাউল' কাকে বলে? বাউল সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৭. লালনের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে যা জান আলোচনা কর।

১১.২.৬৯ ১৪১-২৫৮